বন্ধ দরোজায় ধাক্কা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

ষাটের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্য আবির্ভাব ঘটেছিল যে-আগন্তুক ঋতুর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার অন্যতম বার্তাবহ। শুধু তা-ই নয়, তিনি ছিলেন সেই বার্তাবহ দলের পুরোবাগে, নেতৃত্বের আসনে। প্রাবন্ধিক হিসাবে সে-কারণে তাঁকে নবীনের অগ্রযাত্রাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। দিতে হয়েছে *বন্ধ দরোজায় ধাক্কা*। কিন্তু তাই বলে চিরায়তকে কখনো বিস্মৃত হন নি তিনি। অবক্ষয়িত যুগের মূল্যবোধ যখন চিরায়তকে প্রায় ধুয়ে নিতে চায় তখন বিদগ্ধজনের নিস্পৃহতার সুযোগ সমকালীনতার খণ্ডচেতনা মূল্য পেয়ে যায় স্থায়ী বলে। তাই চিরায়তের পক্ষেও দাঁড়াতে হয় কাউকে-না-কাউকে। এই কাজই সম্পন্ন করেন প্রাবন্ধিক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। *বন্ধ দরোজায় ধাক্কা* পড়ে আবারও। নবীন আগন্তুকের পক্ষে ঝাণ্ডা ওড়াবার জন্য যেমন আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আবদুশ শাকুর বা লুৎফর রহমান রিটনকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হয় তেমনিভাবে নিরসন করতে হয় জনপ্রিয় লেখক কি অলেখক বা রবীন্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক—এইসব সমস্যারও। অর্থাৎ কি আগন্তুক কি চিরায়ত—সকলের পক্ষেই তাঁকে দিতে হয় *বন্ধ দরোজায় ধাক্কা*। এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সেই আঘাতের শব্দে উচ্চকিত।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। খুব অল্পসংখ্যক মানুষের জন্যই এ-ধরনের অভিধা যথার্থ হয়। শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপকের ভূমিকায় তিনি উন্নত জীবনবোধ, রসময়তা ও মহৎ জীবনবোধের প্রাঞ্জল কথক। তাঁর অধ্যাপনাকাল তিরিশ বছর (১৯৬২-৯২)। ষাটের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নতুন জীবনবোধ ও চেতনা জেগে ওঠার কালে তিনি অবতীর্ণ হন এর নেতৃত্বে। মধ্যষাট থেকে পরবর্তী এক দশক ধরে সাহিত্য-পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনায় সেইসব উন্মুখর সাহিত্যযাত্রীকে সমন্বিত রেখেছেন। ষাটের দশকের সূচনা থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র মনস্বী, রুচিমান, বিনোদন-সক্ষম যে-ক'জন ব্যক্তিত্বকে উপহার দিয়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম। বিনোদন ও শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠানে পথিকৃৎ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মননশীলতা ও বিনোদন দুই ধারাতেই অনন্য। ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, জার্নাল ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর ১৪টি বই সৃজনশীলতা ও মননের পরিচয়বাহী। ব্যক্তিত্বের এই বহুমুখী। গুণপনা সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বার লক্ষ্যে 'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের সংশপ্তক হিসেবে বিশ বছর ধরে তিনি সংগ্রামশীল।

তাঁর জন্মস্থান পার্ক সার্কাস, কলকাতা; জন্মসাল : ২৫ জুলাই ১৯৩৯। পৈত্রিক নিবাস : কামারগাতি, কচুয়া, বাগেরহাট। বর্তমান ঠিকানা : ৩৬৭/১/এ ফ্রিস্কুল স্ট্রিট (দোতলা) ঢাকা ১২০৫। শিক্ষা : মাধ্যমিক, পাবনা জিলা স্কুল (১৯৫৫); উচ্চমাধ্যমিক, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট ১৯৫৭; স্নাতক সম্মান (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০); স্নাতকোত্তর : (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১)। পেশা : অধ্যাপনা : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
দ্বিতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ২০০৫
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

দাম
একশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 186 5

BANDHA DAROJAI DHAKKA : by Abdullah Abu Sayeed. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka One Hundred Only.

উ ৎ স র্গ

আবেদ খান
যাঁর সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতার প্রতি
আমি সশ্রদ্ধ

ভূমিকা

১৯৬৭-তে আমার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বরে' আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, নাম 'বন্ধ দরোজায় ধাক্কা'। এই বইয়ের নামটি, লেখকের অনুমতিক্রমে, ওই লেখাটি থেকে নেওয়া।

বিভিন্ন সময়ে লেখা কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা এই বইয়ে সংকলিত হল।

এই বইয়ের 'আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা ও প্রথম গদ্য রচনা। লেখাটি বেরিয়েছিল ১৯৬০ সালে। আমার বয়স তখন বিশ বছর। ওই বয়সে এ ধরনের বিষয়ে চিন্তার স্পষ্টতা আসার কথা নয়। এখানেও তা নেই। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি এখন অনেকটাই ভিন্নমত পোষণ করি। কিন্তু যেভাবে সেই বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছিল, তা কৌতূহলোদ্দীপক। সেই কারণে এটিকে এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

রফিক আজাদের 'অসম্ভবের পায়ে' ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এ বইয়ে আলোচনা রয়েছে। কাব্যগ্রন্থ দুটি তাঁদের একেবারেই প্রথম দিকের রচনা। তাই এদের আলোচনায় তাঁদের সূচনাপর্বের পরিচয়টুকুই কেবল প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের দুজনেরই কবিতাযাত্রা অনেক পরিমাণে প্রসারিত ও গভীরতামুখী হয়েছে। সে পরিচয়, বোধগম্য কারণেই, এখানে নেই।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কম্পিউটার বিভাগের মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সরকার যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। বানানের শুদ্ধতা দেখার সময় নিজামউদ্দীন মুন্সীর কাছে বইটি ভালো লেগেছিল। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হকের কাছে। তাঁর নিঃশর্ত প্রশ্রয় না পেলে এই বই এবারের বইমেলায় বেরোতে পারত না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

১৫.০২.২০০০

জনপ্রিয় লেখকরা কি অলেখক?

১

বাংলাসাহিত্যে অনেক জনপ্রিয় লেখক এসেছেন, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের সমান জনপ্রিয় কেউ হন নি। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি দাবি করে। তাঁর যে কোনো বই বেরোবার সাঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কপি। আমাদের সাহিত্যের হতদরিদ্র প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যা সত্যি সত্যি অবিশ্বাস্য। এদেশের একজন সেরা লেখকের একটি ভালো বইয়ের দেড় হাজার কপির সংস্করণ বিক্রি হতে যেখানে তিন থেকে চার বছর পার হয়ে যায় সেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের এই সংখ্যা তাক লাগিয়ে দেবার মতো। কয়েক বছর আগে বাঙালি লেখকদের জনপ্রিয়তার ওপর পত্রিকায় একটা জরিপ বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে পাঠকপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র আজও বাঙালি লেখকদের শীর্ষে। বোঝা যায় জরিপটি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের। যদি হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের বিক্রির খবর তাঁদের জানা থাকত তবে তাঁরা দেখতেন হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার পাশে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আজ অনেকখানিই ম্লান।

হুমায়ূন আহমেদের মতো অত জনপ্রিয় না হলেও বাংলাদেশে আরও কয়েকজন লেখক রয়েছেন যাঁদের জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলে দেওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম আসবে তিনি ইমদাদুল হক মিলন। তাঁর বইয়ের কাটতি হুমায়ূন আহমেদের মতো অত বেশি না হলেও এই সাহিত্যের যে কোনো খ্যাতিমান লেখকের তুলনায় বহুগুণ বেশি । বেরোতে না বেরোতেই তাঁর যে কোনো বই পাঁচ-সাত হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তসলিমা নাসরিনের বইয়ের কাটতিও ছিল এমনি জমজমাট। হুমায়ূন

আজাদ গভীরতাস্পর্শী লেখক, কিন্তু তিনিও জনপ্রিয়তার নেশায় কমবেশি আক্রান্ত (হয়তো সম্প্রতি ব্যাপারটিকে তিনি একজন লেখকের একটি প্রয়োজনীয় দিক বলেই মনে করছেন)। এই লেখকরাই গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বইমেলাগুলোর যাবতীয় আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্রেতারা এঁদের বই কেনার জন্যেই দলে দলে মেলাতে ছুটে গিয়ে স্টলগুলোকে সরগরম করে, মেলা ঘুরে ব্যাগ ভর্তি করে সেসব কিনে স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে, তারপর আড্ডায় আর গল্পগুজবের আসরে ওইসব বইয়ের মুখর আলোচনায় আসর মাতিয়ে জীবনকে বাসযোগ্য করে তোলে। মেলা বা বইবাজারে এই লেখকেরা এলে এঁদের ঘিরে পাঠকদের ভিড় জমে, স্বাক্ষর শিকারিরা খাতা-কলম উঁচিয়ে এঁদের চারপাশে অশোভনভাবে হুড়োহুড়ি করে, পত্রপত্রিকার সাংবাদিকেরা মেলার ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানতে চান, অনেক পাঠকই এঁদের একবার চোখে দেখার ঘটনাকে জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য মনে করে গর্ববোধ করেন। মোটামুটি সারা দেশের প্রায় সবগুলো বইমেলাই আজ আসলে আয়োজিত হয় এঁদের বই বিক্রির জন্যেই। বাকি আর যেসব বই বিক্রি হয় তা নেহায়েতই উচ্ছিষ্ট হিসেবে, সাহিত্যবাজারের একধরনের বিরস ও বিরক্তিকর উপজাত হিসেবে, যেগুলোর বিক্রি হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে জাতির নিয়তি, উত্থান-পতন বা ভালো-মন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। দেশের বইমেলা বা বইবাজারগুলোর মূল নায়ক আজ এইসব জনপ্রিয় লেখকরাই। এঁরাই আজ এদেশের প্রকাশনা জগতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিয়ন্তা, এঁদের অঙ্গুলিহেলনেই নির্ধারিত হয় কোন প্রকাশক প্রকাশনা ব্যবসার শীর্ষে উঠবেন, কে অসাফল্যের অতলে হারিয়ে যাবেন। প্রকাশনা জগতের এঁরা যে কেবল নিয়ন্তা তাই নন, এঁরা আছেন, লিখছেন এবং তা বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে বলেই হয়তো আমাদের দেশের প্রকাশনা এখনও জগৎ টিকে আছে। না হলে হয়তো এটি সত্যি আজ অনপনেয় অন্ধকারের শিকার হয়ে বসত। প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তাঁরা সবাই জানেন, বাংলাদেশের সৃজনশীল বই প্রকাশনার বিরাট কর্মকাণ্ডটি ব্যবসা হিসেবে আজও কতটা অলাভজনক। প্রকাশনা আজও এদেশের গুটিকয় শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষের একটি ব্যয়বহুল শৌখিনতা মাত্র। বড় ধরনের লাভের কথা ভেবে এই ব্যবসায় কেউ আসেন না, এলেও সেই লাভ পান না। যদি এই ব্যবসা থেকে কেউ লাভ পানও সেটা এতই কম যে ওই মূলধনকে তাঁরা ব্যাংকে ফেলে রাখলেও হয়তো ওর কাছাকাছি লাভই পেতেন। যদি কেউ ভাবেন যে বই প্রকাশনা থেকে তাঁরা মোটামুটি লাভ করছেন তবে বুঝতে হবে তাঁরা এমন অনেক কিছুকে লাভ বলে গণনা করছেন ব্যবসার হিসেবে আসলে যেগুলো লোকসান। একটি মোটামুটি ভালো বইয়ের দেড় হাজার

কপির একটি সংস্করণ বিক্রি হতে সময় লাগে প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর। বছরে শতকরা সাত-আট ভাগ মুদ্রাস্ফীতি ও মূলধনের বার্ষিক ব্যাংক সুদ (চক্রবৃদ্ধি হিসেবে বছরে অন্তত ২০%) গণায় ধরলে এই পাঁচ বছরে যে পরিমাণ টাকা লাভের অঙ্ক থেকে বাদ দিতে হয় তা দেওয়ার পর কী করে ওই ব্যবসায় লাভ থাকতে পারে তা আমার বোধে আসে না। আজও প্রকাশনা যে আমাদের দেশে ব্যবসা হিসেবে লাভজনক নয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের দেশের বৃহত্তম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারা'র ধীর, নিঃশব্দ ও বেদনাদায়ক বিলুপ্তি। 'মুক্তধারার' প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল আঠার শ। সংখ্যার দিক থেকে 'মুক্তধারা' ছিল এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থা। এর কর্ণধার ছিলেন আমাদের সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর চিত্তরঞ্জন সাহা। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা থেকে জন্ম নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানকে এই দেশপ্রেমিক ও আত্মোৎসর্গিত মানুষটি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশের সমান করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশাল নোট বইয়ের প্রতিষ্ঠান পুঁথিঘরের সমস্ত টাকা তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। এর পরেও প্রচুর ব্যাংক ঋণ নিয়ে ও একসময় ওই ঋণে জর্জরিত হয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি, কিন্তু 'মুক্তধারা'কে বাঁচাতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের দেশে কী ভবিষ্যৎহীন আর নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে রয়েছে ব্যবসাটি। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাংলাদেশের টাকায় বই ছেপে ইয়োরোপ বা আমেরিকার বাজারে সেগুলোকে ডলারে বেচতে পারে কিংবা বইয়ের দাম অন্য প্রকাশকদের তুলনায় মাত্রাতিরিক্তরকমে বেশি রেখে কয়েকটি চিহ্নিত ও লাভজনক মহলে বিক্রি করতে পারে তবে অবশ্য তার পক্ষে লাভ করা হয়তো সম্ভব। বস্তুত আমাদের দেশে এমন দু-একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছেও। কিন্তু আমি এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'বাংলাদেশী প্রকাশনা' বলতে চাইব না। এগুলোর লক্ষ্য বিদেশী ক্রেতা অথবা বাংলাদেশের একধরনের বিশিষ্ট ক্রেতা, দেশের জনগণ নয়। যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র বাংলাদেশের পাঠকদের জন্যে বই বের করে তাদের অবস্থা সত্যি সত্যি শোচনীয়। মোটামুটি দু ধরনের মানুষ আজ বাংলাদেশের বইয়ের প্রকাশনায় আসেন। এক, যাঁরা শিল্প-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করাকে সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গাঁটের টাকা ঢেলে এই কাজ চালিয়ে যান। দুই, যাঁদের গাঁটে অঢেল কালো বা সাদা পয়সা রয়েছে, ব্যবসাট্যাবসা করার কথা ভাবছেন, বইয়ের ব্যবসাকে জাতে ওঠার সিঁড়ি মনে করে তা করার ব্যাপারে উৎসাহী হন তাঁরা। দুই ক্ষেত্রেই বৈধ-অবৈধ উৎস থেকে পাওয়া টাকা ভর্তুকি দিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হয়। না হলে ও থেকে যা আসে বা দুর্ভাগ্য আরও বেশি হলে যে নিঃশব্দ ও অলক্ষ্য লোকসান বয়ে বেড়াতে হয় তা

উজিয়ে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে এই ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। যাঁরা এই ব্যবসা করেন তাঁরা এক ধরনের মানসিক পরিতৃপ্তি বা আনন্দের জন্যেই এই ব্যবসা করেন, লাভের জন্যে নয়। যাঁরা ছোট ব্যবসায়ী তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত শ্রমের আর্থিক মূল্যকে ব্যয়ের খাতা থেকে বাদ দেন বলেই এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের সৃজনশীল এবং উন্নতমানের বইয়ের প্রকাশনা হয়তো ধুঁকে ধুঁকে কোনোমতে টিকে থাকত, কিন্তু একে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এই জনপ্রিয় লেখকেরা। বই ব্যবসার অঙ্গনে এঁদের বই চাঙ্গাভাব সৃষ্টি করে রাখতে পেরেছে বলেই এটা সম্ভব হতে পারছে। একজন প্রকাশক যদি বছরে দুমাযুন আহমেদের একটি বা দুটি বই বের করে বসতে পারেন (কেউ কেউ তা করেনও) তবে তা থেকে তিনি যে পরিমাণ বাড়তি মুনাফা পান তা দিয়ে ফেলে ছড়িয়েও তিনি আট-দশটা ভালো মানের গুরুত্বপূর্ণ বই বের করার ঝুঁকি নিতে পারেন। আমাদের দেশের সৃজনশীল ও উন্নতমানের বইয়ের প্রধান অংশটা সত্যি সত্যি বেরোচ্ছেও এভাবেই, এখানকার জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের জমজমাট কাটতির উপজাত হিসেবে। আজ বাংলাদেশে যে এত বিপুল সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্য, সমাজ বা বিজ্ঞানের বই বের হতে পারছে তার অনেকটাই এইসব লেখকদের বিপুল পাঠকপ্রিয়তার কাছে ঋণী।

২

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের এই ধারা খুব বেশিদিনের নয়। আজকে আমরা জনপ্রিয় লেখক বলতে যাঁদের বুঝি সে ধরনের লেখক উনিশ শতকে ছিল না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ—আজকের অর্থে এঁদের কেউই ঠিক জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের মতো সেকালের পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমিত। তা ছাড়া বইয়ের দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি ছিল বলে বইয়ের ক্রেতা ছিল হাতে গোনা। তাই লেখক খুব বেশিরকম শক্তিশালী না হলে তাঁর বই প্রকাশিত হওয়া বা হলেও সে বইয়ের ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হত না। যাঁরা খুবই জনপ্রিয় হতেন তাঁদের বইয়েরও কাটতির একটা সীমা থাকত। বঙ্কিম বা ডি.এল. রায়ের লেখা সেকালে খুবই পাঠকপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু তাঁদের বইয়ের কাটতি কিছুতেই আজকের জনপ্রিয় লেখকদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেকালের একজন ভালো লেখকের বইয়ের কাটতি কী পর্যায়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি শোনালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কোনো একটা বইয়ের (বইটার নাম এ মুহূর্তে মনে

পড়ছে না) প্রকাশের আগে তিনি প্রেসের লোকদের বলেছিলেন : বইটার কাটতি একটু বেশিই হবে হে, শ তিনেক কপির কম ছাপা ঠিক হবে না।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই অবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এই সময়ে যেমন আকারে আয়তনে বড়সড় হয়ে ওঠে, তেমনি, মুদ্রণ-প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে বই আর পত্রপত্রিকা সাধারণ পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার ভেতর এসে পড়তে শুরু করে। ফলে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা হয়ে পড়ে আগের চাইতে অনেক পরিব্যাপ্ত ও বিশাল। উন্নতমানের বইয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের হালকা ও মুখরোচক বইয়ের চাহিদা বেড়ে যায়, এবং গুরুগম্ভীর লেখাওয়ালা মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি নানা ধরনের বিচিত্র ও রমণীয় লেখায় ভরা এক ধরনের স্বাদু ও রম্য পত্রিকা বিপুলভাবে পাঠকদের মনকে আকর্ষণ করতে শুরু করে।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র জেগে উঠেছিলেন এই পটভূমি থেকেই। জনপ্রিয় লেখক বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যের প্রথম জনপ্রিয় লেখক তিনিই। সাহিত্য পড়াশোনার এই প্রসারিত পরিবেশ যে কেবল শরৎচন্দ্রের মতো একজন বিপুল জনপ্রিয় লেখকেরই জন্ম দিয়েছিল তাই নয়, এই পরিবেশ লেখকদের ভেতর আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছোনোর এমন একটা প্রেরণা স্ফুরিত করে তুলেছিল যে সারা বাংলা সাহিত্যের ভেতরেই তা একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাংলা গদ্য উনিশ শতকী গুরুগম্ভীর চাল ছেড়ে সহজ প্রাঞ্জল ও জনমুখী চেহারা নিতে শুরু করেছিল, কথাসাহিত্যে সামন্ত ও উচ্চবিত্তদের বদলে আপামর মানুষের—এই কথাসাহিত্যের পাঠকদের—জীবন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল আসল উপজীব্য, জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল। এমনকি সবুজপত্রের যুগে সাধু ভাষাকে সরিয়ে চলিত ভাষা চালুর যে অবিরাম জেহাদ প্রমথ চৌধুরী চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন তার অন্তঃস্রোতেও হয়তো এই গণমুখিতার চেতনাই ছিল মূল প্রেরণা ও আসল চালিকাশক্তি।

এই সময় থেকেই মোটামুটিভাবে বাংলাভাষার জনপ্রিয় লেখকদের যুগ। জনপ্রিয় লেখক মানে বিপুলসংখ্যক পাঠকনন্দিত লেখকদের যুগ—যে লেখক সাহিত্য জগতের বিদগ্ধ ও রুচিশীল পাঠককে তৃপ্ত করতে পারুন আর নাই পারুন, বিপুল ও সাধারণ পাঠকসম্প্রদায়ের মনকে আনন্দে ও সভীরতায় তৃপ্ত করতে পারেন, তাঁর লেখার আকর্ষণকে তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারেন—তাঁদের যুগ। এককথায় জনপ্রিয় লেখক বলতে বোঝাতে শুরু করে তাঁদেরকেই, যাঁদের প্রতিটি বই বেরোবার খবর হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে হইচই পড়ে যাবে, বই কিনতে পাঠককে দোকানের সামনে

কিউতে দাঁড়াতে হবে, তারপর পাগলের মতো এক নিশ্বাসে বইটি পড়া শেষ করে পরের বইয়ে লেখক কী নিয়ে আসছেন তার জন্য উন্মুখ ও প্রতীক্ষাতুর সময় কাটাতে হবে। এক সময় এটা ছিল ইয়োরোপ আমেরিকার লেখকদের গল্প, এই সময় থেকে সে গল্প হয়ে উঠতে থাকে আমাদের লেখকদের।

শরৎচন্দ্রের পর এই শতকে যিনি এই ধরনের জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী। এক দশক আগে পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি বইয়ের ইনারে ছাপা থাকত এ পর্যন্ত সেটির কতগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে এবং প্রতিটি সংস্করণ কত কপি করে ছাপা হয়েছে। এসব তুলে ধরা হত বইটির জনপ্রিয়তার পরিমাণ বোঝানোর জন্যে, যাতে পাঠকেরা তার গুরুত্ব টের পায় ও বইটি কেনার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আজও যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা খুব একটা কমেছে তা মনে হয় না। মুজতবা আলীর পাশাপাশি সে সময়ে আর একজন লেখক অসম্ভব জনপ্রিয়তাকে ছুঁয়েছিলেন, তিনি যাযাবর। চল্লিশের দশকে তাঁর লেখা 'দৃষ্টিপাতে' তাঁর ঝরঝরে চৌকস ও দ্যুতিময় গদ্য সেকালের পাঠকের চোখে অনাস্বাদিত নতুনত্বের বিস্ময় ফুটিয়েছিল। এঁদের পরের গত পঞ্চাশ বছরের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য জনপ্রিয় লেখকে কমবেশি ভরা। অবধূত, জরাসন্ধ, বিমল মিত্র, শঙ্কর, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—এঁদের প্রায় সবাইকে কমবেশি জনপ্রিয় লেখকদের দলে ফেলা যায়। একালে লেখক হতে গেলে তাকে কমবেশি জনপ্রিয় হতেই হয়, না হলে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী লেখকের পদপাত ঘটে নি বললেই চলে। এই সময়ের প্রায় সবটা জুড়েই এইসব জনপ্রিয় লেখকের রাজত্ব। এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং খ্যাতিমান অলেখক মোটামুটি এঁরাই।

৩

একজন জনপ্রিয় লেখক, সব সমাজের মতোই, আমাদের সমাজেও একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষ। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সার্বক্ষণিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। তাঁর লেখা সবার হাতে হাতে আবর্তিত—পঠিত ও আলোচিত। (দেশের সবার অভিনন্দনের তিনি মধ্যমণি, সবার পরিচিত ও প্রিয়।) তাঁর চেয়ে বহুগুণ শক্তিধর লেখকদের চেয়েও তিনি জনসাধারণের কাছে বেশি পরিচিত এবং তাদের কাছে সাহিত্যজগতের ওইসব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তায় ঘাবড়ে গিয়ে সাধারণ পাঠকদের অনেকেই তাঁকে তাঁর চেয়ে অসঙ্গত মাপের

বড় লেখক ভেবে বসেন ঠিক যেভাবে বিদেশ থেকে বাংলাদেশ দেখতে আসা কোনো পর্যটক ঢাকার সুবিশাল মানিক মিঞা অ্যাভিনিউ দেখে মানিক মিঞাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মনে করে বসতে পারেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এই বিপুল প্রতিপত্তি শক্তিমান লেখকদেরও অনেকসময় এতদূর বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে দিতে পারে যে তাঁরাও তাঁকে 'সাহিত্য-শিল্পী' ভাবতে শুরু করতে পারেন এবং দেশের কর্ণধারদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান আমাদের দেশের মতো হলে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার এমনকি একুশে পদকের মতো জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে বসতে পারেন। এর কিছু প্রমাণও আছে আমাদের দেশে। একালে টেলিভিশনের নন্দিত তারকারা জনসাধারণের হৃদয়ে যে ভালোবাসার জায়গায় আসীন, তাঁদের জায়গা, লিখিত মাধ্যমে কাজ করেন বলে, তাঁদের চেয়ে খানিকটা সীমিত হলেও গুরুত্বে এবং প্রভাবের দিক থেকে অনেক বেশি। দেশের সবার কাছে গ্রহণীয়, প্রিয় ও সম্মানিত মানুষ তাঁরা।

পৃথিবীতে ভাষা উদ্ভাবনের ফলে জন্ম হয়েছিল লেখকের, একালের শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অভাবিত বিকাশের ফলে জন্ম হয়েছে 'জনপ্রিয় লেখকের'। পৃথিবীর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও এটা ঘটেছে। ইয়োরোপে এটা শুরু হয়েছে উনিশ শতক থেকে, বাংলা সাহিত্যে এই শতকের শুরু থেকে, বাংলাদেশের সাহিত্যে গত আশির দশক থেকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অপ্রতিহত বিস্তৃতির ফলেই এ ব্যাপারটা ঘটেছে। সবাই জনপ্রিয় লেখক হন না, কেউ কেউ হন। শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসে কেবল হাতে গোনা দু-একজনেরই। এক বিশেষ ধরনের গুণপনা ছাড়া এ সাফল্য সম্ভব নয়। এই গুণগুলো কী তা নিয়ে কিছুটা কথা বলা যেতে পারে।

এর আগে যে কজন জনপ্রিয় লেখকের নাম আমি উল্লেখ করেছি একটা জায়গায় তাঁদের মিল লক্ষ করার মতো : তাঁরা প্রায় সবাই ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের যতগুলো পরিচিত আঙ্গিক রয়েছে উপন্যাসই তার মধ্যে সবচেয়ে পাঠকপ্রিয়, রুচিকর ও রমণীয়। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিচিত্র রূপরসে কাহিনীর ভেতর দিয়ে গা-এলিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় উপন্যাসে, পাঠকের চিন্তাশক্তির ওপর খুব একটা চাপ না দিয়ে। উৎকণ্ঠা, সাসপেন্স, নাটকীয়তা, ভয়-বিস্ময় বা সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে খোশগল্পের মেজাজে তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তাই উপন্যাস পড়ার একটা আলাদা আমেজ আছে। উপন্যাসের এই অনায়াস এবং মচমচে স্বাদের কারণেই একালের হালকা মেজাজি ও গড়পড়তা পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কাজেই একজন জনপ্রিয় লেখক যাঁর বই প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কপি বিক্রি হবে তাঁর ঔপন্যাসিক না হয়ে প্রায়

কোনো উপায়ই নেই। কবিতার মতো একটি পরিশ্রুত শিল্পমাধ্যম, ঘনবিবদ্ধ নাটক, মননধর্মী ছোটগল্প বা প্রবন্ধ—এদের কারো পক্ষেই উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার শক্তি নেই।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে আমাদের দেশের সবখানে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুল ও সুকান্তের নিয়মিত জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। এঁদের সমকক্ষ লেখক—বিশেষ করে নজরুল বা সুকান্তের সমকক্ষ বা তাঁদের চেয়ে বড় বা প্রতিভাধর মানুষ যে এই জাতির মধ্যে নেই তা নয়—যাঁদের জন্মদিন একইরকম বা এঁদের চেয়েও অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হওয়া উচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, জীবনানন্দ, মানিক, তারাশঙ্কর—এমনি আরও অনেক লেখকই হয়তো রয়েছেন এঁদের দলে। কিন্তু এঁদের জন্মজয়ন্তী তেমন ঘটা করে অয়োজিত হয় না, অধিকাংশ সময় আদৌ পালিত হয় না! পক্ষান্তরে ঐ তিনজন লেখকের জন্মবার্ষিকী পালিত হয় অবিশ্বাস্য বর্ণাঢ্যভাবে। (কেবল বর্ণাঢ্যভাবেই নয়, জন্মজয়ন্তী উদযাপনের বাজারে তাঁদের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া।) কেন তাঁদের ভাগ্যের শিকে এভাবে ছিঁড়েছে? এর কারণ সোজা: এমন কিছু জনন্দিত কবিতা বা গান এঁরা লিখেছেন যা দিয়ে বিপুলসংখ্যক দর্শককে মনোরঞ্জন করার মতো নাচে-গানে-আবৃত্তিতে সরগরম একটি জমজমাট ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব। জন্মজয়ন্তীর বেলায় কবিতা ও গানের যে ভূমিকা, জনপ্রিয় লেখকদের বেলায় উপন্যাসের ভূমিকা তাই। উপন্যাস রচয়িতা না হয়ে জনপ্রিয় লেখক হওয়া কঠিন।

কাজেই জনপ্রিয় লেখক মানে মোটামুটিভাবে উপন্যাসের লেখক। তবে উপন্যাস ছাড়াও হালকা চালের রম্যরচনাকারেরাও অনেক সময় জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পারেন। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুজতবা আলী বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এর উদাহরণ।

কিন্তু উপন্যাস বা রম্যরচনা হলেই যে তা জনপ্রিয় হতে পারবে তা নয়। এক বিশেষ ধরনের চরিত্রসম্পন্ন লেখাই কেবল সব ধরনের পাঠক সম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বজনীনভাবে আদরণীয়। জনপ্রিয় লেখার—তা সে উপন্যাস রম্যরচনা বা অন্য যে কোনো সাহিত্য-মাধ্যমের বই হোক না কেন, তার ভেতর সবচেয়ে বড় যে গুণটি থাকতেই হবে তা হল প্রাঞ্জলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। সে লেখাকে হতে হবে তাজা হাওয়ার মতো ফুরফুরে আর স্বাস্থ্যকর। তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। পাঠকের মনের ভেতর পৌঁছোতে হবে অনায়াসে। পড়ার প্রতিটি মুহূর্তে তার মনকে এক রম্য উৎসাহ আর চনচনে অনুভূতিতে সজীব করে রাখতে হবে। প্রাঞ্জলতা এমন এক গুণ যা যে কোনো লেখাকে সহজেই পাঠকপ্রিয় করে তুলতে পারে এবং সামান্য পুঁজি নিয়েও পাঠকবাজারে তার

ভালো ব্যবসার সুবিধা করে দিতে পারে।

লেখা জনপ্রিয় হবার জন্যে প্রাঞ্জলতার পাশাপাশি যে গুণটি থাকা লেখার জন্যে খুবই জরুরি তা হল বিনোদন বা রম্যতার গুণ। লেখক নানাভাবে লেখার শরীরে এই রম্যতার আমেজ বুলিয়ে যেতে পারেন। যেসব ভাবে তা হতে পারে তার একটি হল বিরতিহীনভাবে কৌতুকরসের যোগান দিয়ে যাওয়া। লাইনে লাইনে পাঠকের মনকে কৌতুকের উষ্ণ তপ্ত রসে উচ্চকিত করে রাখতে পারলে সেই লেখার জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে যায়। মুজতবা আলী, শিবরাম বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যে এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছেন তার মূলে আছে কৌতুকরসের এমনি এক অফুরন্ত ও বিরতিহীন প্রস্রবণ। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তার অর্ধেকের বেশি, আমার ধারণা, এই হাস্যরসের কাছে ঋণী। কেবল এঁরা নয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের কয়েকজনের—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা যে এমন আস্বাদ্য, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও সম্পন্নতাময় হতে পেরেছে তার অনেকটাই এই কৌতুকরসের আনুকূল্যেই, যদিও এঁদের কৌতুকরসের গুণগত মান আগের লেখকদের চেয়ে অনেক উঁচুমানের।

প্রেমের অগভীর ফেনিল আবেগ-উচ্ছ্বাস, বিশেষ করে প্রথম যৌবনের মিষ্টি রঙিন প্রেম, এর অপার্থিব সুখ ও অকথ্য যন্ত্রণা, এর সুনীল স্বপ্নজগৎ ও নরম কোমল আবেশ আপামর পাঠকের খুবই প্রিয় জিনিস। একে পুঁজি করে একজন পাঠকের পক্ষে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব। বড় বা ভালো লেখকদের মধ্যে গ্যেটের 'ভের্টর', এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'তিন বন্ধু', স্টিফেন ৎসোয়াইগের 'প্রিয়তমাসু' এই ধরনের আবেগকে পুঁজি করে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী', ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'চিতা বহ্নিমান' এ ধরনের সাফল্যের উদাহরণ। আরো সাধারণ মাপের লেখকেরাও এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বইয়ের কাটতির ব্যাপারে বিপুল লাভবান হয়ে যেতে পারেন। ইমদাদুল হক মিলনের বইয়ের কাটতির মূলে বেশ খানিকটাই রয়েছে এই ধরনের প্রেমের পেলব ও শিশিরস্নিগ্ধ আবেশ। কেবল উপন্যাস নয়, কবিতাতেও প্রেমের এই কোমল মেদুর আমেজ একজন কবিকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে দিতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মহাদেব সাহার কবিতা এর সুন্দর উদাহরণ। কবি হয়েও ইদানীংকার বইমেলাগুলোয় তাঁর নাম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নামের পাশাপাশি উচ্চারিত হচ্ছে।

সমকালীন জীবন ও রাজনীতির তরতাজা উত্তেজনা ও উত্তাপকে তুলে ধরতে পারলে একটা বইয়ের পক্ষে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যাওয়া সম্ভব। রগরগে যৌনতার সহযোগ যে অনেক উপন্যাসকে 'সর্বোচ্চ বিক্রীত' বইয়ের সৌভাগ্য দিতে পারে তার উদাহরণ সারা পৃথিবীতে অবিরল।

৪

কী কী গুণ থাকলে একজন লেখক জনপ্রিয় হন তা ছোট্ট করে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করলাম। এখন প্রশ্ন : এই গুণগুলো আয়ত্ত করতে পারলে একজন লেখক জনপ্রিয়তার শিরোপা পাবেন ঠিকই, কিন্তু 'লেখক' পদবাচ্য হয়ে উঠবেন কি? তাঁকে কি আমরা 'শিল্পী' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারব—যে শিল্পী সময়ের করাল ঢেউ অতিক্রম করে দীর্ঘায়ু পাবেন। আমি জানি, অনেকেই তা করতে চাইবেন না। কেন চাইবেন না, একটা উদাহরণ দিয়ে তা বলার চেষ্টা করি। হুমায়ূন আহমেদ কেবল বাংলাদেশ নয়, বাংলা সাহিত্যের এ-যাবৎকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক, পাঠকপ্রিয়তা বা বইয়ের কাটতির দিক থেকে তাঁর অবস্থান আজ তুঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ করেছি, এমন বিপুল জননন্দিত লেখক হবার পরও প্রায় কোনো ভালো লেখক বা পাঠকই তাঁকে 'লেখক' মনে করেন না। করলেও খুবই সাধারণ মাপের লেখক মনে করেন। মনে করেন এমন একজন গড়পড়তা লেখক বলে যিনি নামহীন পরিচয়হীন আর দশটা সাহিত্যকর্মীর মতো কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্যের জগৎ থেকে পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যাবেন। কেন এমনটা হবে? তা হলে কি জনপ্রিয়তার গুণ আর লেখকের গুণ আলাদা। নাকি জনপ্রিয়তার গুণগুলো এমন একটা জিনিস যা একজন সত্যিকার লেখকের মধ্যে কমবেশি থাকলেও তাঁর মধ্যে থাকতে হয় এর অতিরিক্ত কিছু, শিল্প ও জীবনবোধের কিছু বাড়তি সম্পদ—যা না থাকলে তিনি ঠিক শিল্পী হয়ে ওঠেন না।

হুমায়ূন আহমেদের ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল হওয়ায় আমি কয়েকজন সাধারণ পাঠককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁরা হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়েন কেন। তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, ভালো লাগে তাই। কথাটার মানে একটাই : তাঁর লেখা সুখকর, পড়লে আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে যে গুণটির ওপর জোর পড়েছে তা হল এর স্বাদুতা বা রম্যতা, যা এর শরীরময় প্রাণবাণ থেকে সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। ব্যাপারটাকে আরও একটু খতিয়ে দেখার জন্যে আমি কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ-তরুণীকে এর কাছাকাছি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম, ওই লেখককে তাদের কেন ভালো লাগে। অনেকেই উত্তর দিয়েছিল, পড়ার পরে মনে থাকে না, কিন্তু পড়ার সময় ভালো লাগে। উত্তরটার মধ্যে হুমায়ূনের লেখার একটা সরল মূল্যায়ন আছে। সেটা হল : এই লেখা খুশি করে কিন্তু কিছু দেয় না। এর মানে একটাই : এই লেখা বিনোদন দেয় কিন্তু জীবনকে জোরালোভাবে কামড়ে ধরে না, এমন ভালো বা বড় কিছু উপহার দেয় না যা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনকে দীর্ঘমেয়াদে কৃতজ্ঞ করবে। মূল্যায়নটার মধ্যে জনপ্রিয় লেখকদের একটা মোটামুটি চেহারাও ফুটে ওঠে। তা হল, এঁদের

লেখায় বড় বা স্থায়ী কিছু না থাকলেও এঁরা এক ধরনের বিনোদন দেয়, যে বিনোদন মচমচে ও স্বাদু, যা অপ্রতিহত আকর্ষণে পাঠককে তার দিকে টেনে নেয় এবং এক ঝাঁজালো সম্মোহনের ভেতর তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিনোদন একজন 'জনপ্রিয়' লেখকের মূল ও হয়তো একমাত্র সম্পত্তি।

এ থেকে কেউ যেন এমন কথা ভেবে না নেন যে বিনোদন কেবল জনপ্রিয় লেখকদের একলার সম্পত্তি। এই বিনোদন বড় লেখকদেরও একইরকম দরকার। কেবল বড় লেখক নয়, কাউকে লেখক নামের যোগ্য হতে গেলে প্রথম যে উপাদানটি তাঁর ভেতর ন্যূনতমভাবে থাকতেই হয় তার নামও বিনোদন। এ না হলে তা আর যাই হোক লেখা হয়ে ওঠে না। কেবল লেখা নয়, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য এমনি যে শিল্পের কথাই আমরা ধরি না কেন এদেরও প্রথম ও অব্যাহতিহীন উপাদান হল বিনোদন, শিল্পে যার অন্য নাম লাবণ্য। পাঠকের বা দর্শকের মনে খুশি বা আনন্দের আবেগ জাগিয়ে তুলতে না পারলে তা শিল্পের পর্যায়ে উঠে আসে না। এটুকু পারতেই হয় একজন শিল্পীকে, পাঠকের মনকে তাঁর কথা গ্রহণ করতে পারার মতো উপযোগী, উন্মুখ ও প্রসন্ন করে তুলতেই হয়। না হলে তাঁর বক্তব্য পাঠকের নিস্পৃহ হৃদয়ে তিনি কিছুতেই সপ্রাণভাবে পৌঁছে দিতে পারেন না। তাই বিনোদন হল শিল্পের সেই সোনালি দরজা যার ভেতর দিয়ে শিল্পের বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে আনন্দমধুর অভ্যর্থনায় অভিষিক্ত হয়, আনন্দোজ্জ্বলতার ভেতর দিয়ে গৃহীত হয়। না হলে তা পাঠকের হৃদয়ের পাশে মাথা কুটে পড়ে থাকে। রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা বা ইলিয়ডের মতো মহাকাব্য; শেক্সপিয়ার, সোফোক্লিস বা ইবসেনের নাটক বা টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও সার্ভেন্টিসের উপন্যাসগুলোতে মানব উপলব্ধির অনেক উঁচু ও উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করার পরও যে মানবসম্প্রদায়ের হৃদয়কে আজ পর্যন্ত এমনভাবে নন্দিত ও সম্মোহিত করে রাখতে পেরেছে তার কারণ এদের ভেতরকার অসাধারণ বিনোদনের শক্তি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও বিনোদন বলতে কৌতুকরসের বা রোমান্টিক প্রেমের জোলো ও চটুল অবতারণা বোঝেন। আসলে বিনোদন এমন কোনো সীমিত জিনিস নয়। সংস্কৃত নন্দনতাত্ত্বিকেরা শিল্পের যে আনন্দময় দেহকান্তির কল্পনা করেছেন এই বিনোদন তার অন্তরের সম্পন্ন ও অনিন্দ্য নাম। যে নটি রসের কথা তাঁরা বলেছেন, কোনো লেখার মধ্যে তার যে কোনো একটি বা একাধিক রস সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে আমাদের মনে আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ। এ রম্যতা কেবল কৌতুকরসের রম্যতা নয়, রসমাত্রেরই রম্যতা। ভয়ের ঘটনা বা আবেগও শিল্পিতভাবে রূপায়িত হলে তা আমাদের মনে পুলকের অনুভূতি বয়ে আনে; যেহেতু আমরা জানি

এ ভয় প্রকৃত ভয় নয়, ঐ ভয় বা বিভীষিকার ত্রাসজাগানো মুখচ্ছদ মনে আতঙ্ক জাগালেও এ আসলে শিল্পের ভয়, জাগতিক ভয়ের সৌন্দর্যায়িত ও রমণীয় অনুকরণ মাত্র। এ জন্যে শিল্পের ভয় দেখে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে পালিয়ে যাই না, বরং সেই ভয়কে আরও বেশি করে খুঁজে বেড়াই, সেই ভয়কে ভয় পেতে ভালোবাসি। শিল্পের বিরহের প্রসন্নতার ভেতর থেকে কবি তাই অনায়াসেই বলতে পারেন : 'বিরহ মধুর হল আজি'। বাস্তব জগতের যে ক্রোধ আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে শিল্পের ভেতর সেই ভয়াবহ ক্রোধের দৃশ্যই আমাদের কাছে প্রিয় ও কাম্য হয়ে ওঠে, সেই ক্রোধ ফিরে ফিরে দেখার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে পড়ি। শিল্পের ভেতর আনন্দের এই অবারিত সরবরাহ থাকে বলেই এমনটা হতে পারে।

আবারো বলি, এই বিনোদন—পাঠকহৃদয়কে আনন্দিত বা বিনোদিত করার এই গুণ—থাকতেই হবে শিল্পের মধ্যে, না হলে তা শিল্প হবে না; পাঠক বা দর্শকের মনে আনন্দের মাধুরীপ্রবাহ জাগিয়ে তার হৃদয়জগতে লেখক তাঁর গভীর উপলব্ধিগুলোকে কিছুতেই রক্তকণিকার অনন্যসম্পদ করে তুলতে পারবেন না। ইডিপাস নাটকটার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পষ্ট করার চেষ্টা করি। সাধারণ পাঠক বা দর্শককে পুরোপুরি হতাশ ও বিরক্ত করে তোলার মতো রসকষহীন নাটক একটা। সস্তা জনপ্রিয়তার উপাসকেরা একে নিশ্চয়ই সাহিত্য হিসেবে পুরোপুরি খারিজ করেই দিতে চাইবেন। নাটকটায় না আছে একটা হাসির কথা, না আছে সুদর্শন নায়ক বা সুন্দরী নায়িকা, না হৃদয়মাতানো প্রেমের সংলাপ, না অন্য কিছু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল রয়েছে একটা অনিবার্য সর্বনাশের দিকে গম্ভীর ভয়ংকর শ্বাসরুদ্ধকর যাত্রা। তবু ভয়, ক্রোধ, বীরত্ব, দুঃখ এসব আবেগ এখানে এমন মনোরমভাবে চিত্রিত হয়েছে, কাহিনীর জটিল গ্রন্থি এমন অলৌকিক বিস্ময়ময়তায় উদ্ঘাটিত হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধকর সাসপেন্সের পথে এগিয়ে কাহিনী আমাদেরকে পুরো ঘটনাটার সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রেখেছে যে তা থেকে চোখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বীরত্ব, শোক, ক্রোধ, ভয় এখানে আনন্দময় পরিণতির ভেতর এগিয়ে গেছে। এই ঊর্ধ্বশ্বাস নাটকীয়তা, সম্মোহন আর সুতীব্র গতিপ্রবাহ—যা আমাদেরকে আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠার তীব্র ঝোড়ো পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলে তা-ই এর বিনোদন। এই আনন্দ আছে বলেই না আমরা বইটার ভেতর অমন আমুগুপদনখ সেঁধিয়ে থাকি, কাহিনীর প্রতিটি উন্মোচনকে অমন অপলক আর নিরুদ্ধভাবে অনুসরণ করে যাই।

না হলে কি নিয়তিপ্রতাপিত এমন একটা গম্ভীর করুণ আর ভয়ংকর কাহিনী আমাদের এমনভাবে মত্ত করে রাখতে পারত? রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় যদি অমন বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র আর দ্যুতিময় ভাষার ঐশ্বর্য না থাকত, না

থাকত হিরের টুকরোর মতো শব্দের আর জীবনোপলব্ধির উজ্জ্বল সম্ভার, অপরূপ কবিত্ব, গল্প রচনার অমন অনবদ্য চাতুর্য বা প্রেমের অপার্থিব তাজমহল তবে আমরা কি ওই বইয়ের গাঢ় আত্মোপলব্ধির মধ্যে ওভাবে উন্মুখ হতাম। সাহিত্য ছোট-বড় যাই হোক না কেন, তার মধ্যে এই মনকাড়া বিনোদন-মাধুরী, এই অনবদ্য আনন্দ-ঝোরা থাকতে হবেই, না হলে তার প্রাণ আমাদের রক্তে রক্তে নেচে বেড়াবে না। নানান সময় আমি এমন বেশ কিছু চিত্রনির্মাতাকে দেখেছি যাঁদের ছবিতে আনন্দ বা মাধুর্যের অভাব এমনই প্রকট যে তা দেখতে গেলে দর্শকের মাথা ধরে ওঠে, কপালের শিরা দপদপ করে, বিরক্তিতে ক্লান্তিতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, অথচ শিল্পীর কাছে ব্যাপারটা তুলতে গেলে তিনি চোখ রাঙিয়ে পষ্ট জানিয়ে দেন : 'এসব হল গিয়ে আর্ট ফিল্ম, যার-তার জন্যে এসব নয়।' কিন্তু যে ছবি দর্শকের মনকে ভোলাতে বা খুশিই করতে পারল না, তার ভালোবাসা বা আনন্দের জিনিস হয়ে উঠল না, অমন দিগ্বিজয়ী আর্ট ফিল্ম হয়ে তার যে কী লাভ হল, তা বোঝা সত্যি কঠিন।

৫

সব জনপ্রিয় লেখকের মধ্যে এই বিনোদনের গুণটি বেশ ভালোরকমভাবেই আছে, তা না হলে তাঁরা এত বিপুলভাবে আদৃত হতেন না। গুণ আছে বলেই তাঁরা সবার মনোযোগের ব্যাপার হয়েছেন। তবু মনে রাখতে হবে এ গুণটি একজন লেখকের খুবই প্রাথমিক একটি গুণ মাত্র। ভালো লেখক হবার জন্যে শিল্পের আরও অসংখ্য রহস্যময় ও দুর্লঙ্ঘ্য পুলসিরাত পার হতে হয় তাঁকে। শিল্পসৌকর্যের কুটিল জটিল জগতের ওপর সহজ অধিকার থাকার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে থাকতে হয় গভীর ও ব্যাপ্ত একটি উপলব্ধিজগৎ, যেসব দিয়ে নির্ধারিত হয় তিনি কোন মাপের লেখক বা তাঁর শিল্পসিদ্ধি কোন মাপের। শিল্পের এই উপলব্ধিজগৎ বা বিষয়গত দিকটি শিল্পের একটি অত্যন্ত জরুরি জিনিস। একজন শিল্পী শিল্পের কারুকার্যময় রহস্যজগতের ওপর কতটা অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে পারলেন তা বলে দেয় তার শিল্পপ্রতিভা কতখানি, কিন্তু তাঁর ভেতরকার উপলব্ধিজগৎটি সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলে দেয় 'শিল্পী' হিসেবে তিনি কোন মাপের। একজন শিল্পীর এই উপলব্ধিজগৎটি কী, এবার তাই নিয়ে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করি।

কোনো একটি পাঠচক্র কার্যক্রমে শিক্ষকতা করতে গিয়ে কলেজের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছু উন্নতমানের বই পড়াতে হয় আমাকে। বইগুলো নিয়ে আমি অনেকবারই তাদের প্রশ্ন করেছি। বলেছি

ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তারা যে ধরনের বই পড়েছে তা থেকে এই বইগুলো খানিকটা আলাদা কি না। প্রতিবারই আমার কথা কেড়ে নিয়ে তারা বলেছে, 'আলাদা। খুব আলাদা।'

'কী ধরনের আলাদা?' আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি।

'আলাদা, মানে, বইগুলো পড়ে বেশ 'ভাবতে' হয়। অনেক কিছু বোঝার আছে এগুলোতে।' (যা আগে-পড়া বইগুলোতে ছিল না)। এমনি অনেক এলোমেলো অগোছালো কথা দিয়ে তারা ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করে।

তাদের ভাঙাচোরা কথার ভেতর থেকে তাদের মনের অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে। সেগুলো এরকম : 'বইগুলো ভাবায় আমাদের। আমাদের মনের ভেতর ঘা দেয়। মনের নতুন জানালা খুলে দেয়।' ... 'এমন কিছু দেয় যা আগে আমাদের ভেতর ছিল না।'...'জীবনকে নতুনভাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। তাকে নতুন করে দেখায়। আমাদের প্রসারিত করে। বড় করে।' ... 'বইটা পড়ার আগে যে মানুষটি আমরা ছিলাম, বইটা পড়ার পর সে মানুষ আমরা থাকি না। আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাই।'

তারা বইগুলোর উপকারের দিকটাকে তুলে ধরতে চায়। বইগুলো তাদের যে বড় করে তোলে ঘুরেফিরে তার ওপর জোর দেয়।

কাদের ভালোবাসি আমরা পৃথিবীতে? কারা এ সংসারে আমাদের ভালোবাসার পাত্র? ব্যাপারটা নিয়ে একটু খতিয়ে দেখলেই আমরা টের পাই এই পৃথিবীতে তাদেরই আমরা ভালোবাসি যারা আমাদের চেয়ে বড়। প্রতি মুহূর্তের বন্দিদশা থেকে যারা আমাদের মুক্তি দেয়, আমাদের নিয়ে ঊর্ধ্বলোকের পথে উধাও হতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধা (সখীকে) বলছে : আমার (ভালোবাসার) অনুভূতি কী করে বোঝাব তোমাকে! সেই ভালোবাসার কথা যখনই বলতে যাই তখনই দেখি বলা শেষ করার আগেই তা পুরোপুরি নতুন হয়ে গেছে।

এখানে রাধার অনুভূতিকে প্রতিমুহূর্তে যে মানুষটি নিত্যনতুন পৃথিবীর অভিসারী করে রেখেছে তার জন্যেই তো তার আমৃত্যু ক্রন্দন। আমাদের ব্যাপারেও তাই। যে-মানুষ আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও তুচ্ছতর তার জন্যে আমাদের প্রীতি বা করুণা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কাতরতা বা আত্মনিবেদন থাকে না। আমাদের সব কাতরতা সব নিবেদন তাদের জন্যেই গচ্ছিত যারা আমাদের বড় জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পারে, জীবনের বিস্ময়কর শিখরে শিখরে আমাদের নিয়ে পাড়ি জমাতে পারে।

একটা ভালো বই রাস্তায় চলার পথে পলকের জন্যে চোখে পড়ে যাওয়া কোনো সুন্দরীর চতুর কটাক্ষ নয় যা চকিতের জন্যে রক্তে চাঞ্চল্য জাগিয়ে আবার নিজের নিয়মেই মন থেকে মিলিয়ে যাবে, একটা ভালো বই সেই বই

যা আমাদেরকে তার প্রেমে পড়তে বাধ্য করে, মুহূর্তের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। প্রেমের মতো বা দমকা হাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তা আমাদের জীবনকে তছনছ করে, নিদ্রা হরণ করে। কোন গুণে একটা বই এভাবে আমাদের বিপর্যস্ত আর এলোমেলো করে দেয়? একটা কারণই। বড় জীবনের সম্পন্ন শিখরকে আমাদের সামনে মেলে ধরে বলেই। প্রেম যেমন আমাদের জীবনের চিরপরিচিত চেনা আঙিনাকে অজানিতের নতুন হাওয়ায় শিউরে দিয়ে যায়, একটা ভালো বইও তেমনি অসম্ভবের পিপাসায় আমাদের মনটাকে শিউরে তোলে। তাই একটা ভালো বই সেই বই যা কেবল আমাদের বিনোদিত করে না, সমৃদ্ধও করে।

এই জন্যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে : এ গুড বুক ইজ দ্যাট হুইচ ডিস্টার্বস। একটা ভালো বই সেই বই যা আমাদের বিপর্যস্ত করে, স্বস্তিকে বিশৃংখল করে, শান্তি হরণ করে, আর এভাবে আমাদেরকে ভেঙেচুরে নতুন ও উচ্চতর জন্ম দেয়।

ভালো বইয়ের মধ্যে একটা উঁচু ও গভীর চিন্তাজগৎ থাকে বলেই তা সাধারণ পাঠকের কাছে কখনোই পৌঁছোতে পারে না। বিনোদনের স্বাদ, কৌতুকরসের স্বাদ, হালকা চটুল প্রেম বা রোমান্সের আমেজ-লাগা গালগল্পের স্বাদ সব পাঠকই নিতে পারে। কিন্তু মননের শক্তি সবার সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর খুব অল্প মানুষই এর অধিকারী। এই জন্যে ভালো বই সবার বই হয় না। এদের গভীর ব্যাপক তলদেশময় আবেদন আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনোর পথ আজও সম্পূর্ণ অজানা। তার ভেতর যে গভীর উপলব্ধিজগৎ আছে তা-ই তার পাঠকসংখ্যাকে নির্মমভাবে কেটে তাকে একটা ছোট্ট উত্তুঙ্গ কুঠুরির নির্জন বাসিন্দা করে দেয়। এদের সীমিত পাঠকের করুণ নিয়তিই এর প্রমাণ। এদের ভেতরকার সমৃদ্ধিই এদের জনপ্রিয়তার শত্রু। এদের বৈভবময় মননজগৎ, শিল্পোৎকর্ষের অপরিমেয় বিভা এবং বলীয়ান শক্তিমত্তার জন্যেই এরা যেমন আপামর জনসাধারণের জগৎ থেকে চিরনির্বাসিত; তেমনি একই সঙ্গে আবার 'স্মরণের' দীপান্বিত ও কারুকার্যময় শিখরের চিরকালীন বাসিন্দা। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য। মহৎ বিষয়বস্তু আর অনন্যসাধারণ শিল্পসাফল্যের কারণে আজও বইটি সাহিত্যপিপাসু মানুষের চোখে বিস্ময়। কিন্তু কজন পাঠক সত্যি সত্যি পড়ে আজ এ বইটি? কজন পারে এর গম্ভীর সমুন্নত শিল্পরসকে আস্বাদন করতে? হাতে গোনা গুটিকয় মানুষ নয় কি? এমন দিগ্বিজয়ী শিল্প-বৈভবকে কি কোনোদিন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? নাকি তারা এতে উৎসাহী হবে? এই পরাক্রান্ত শিল্প-বৈভব তো তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে! কী করে এমন লেখকেরা জনপ্রিয় হতে

পারেন? জনপ্রিয়তা যদি লেখকের একমাত্র পরিচয় হত তবে আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হত মাইকেলকে? নিশ্চয়ই অলেখকের সারিতে। যে বাংলা সাহিত্যে হুমায়ুন আহমেদ হতেন শ্রেষ্ঠ লেখক, মাইকেল হতেন সেই সাহিত্যের নিকৃষ্টতম লেখক। কাজেই ব্যাপারটা স্পষ্ট যে শ্রেষ্ঠত্ব বা ভালোর সঙ্গে জনপ্রিয়তার কোনো যোগাযোগ নেই। বরং হয়তো বিরোধই আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বা বড় কোনো লেখক কোনোকালে জনপ্রিয় হন নি, আজও কেউ হন না। যে রবীন্দ্রনাথ আজ বাঙালি সংস্কৃতিকে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, কতটুকু জনপ্রিয় তিনি? তাঁর কতটুকু লেখা আমরা পড়ি? পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাঁর শেষের কবিতা বা গল্পগুচ্ছের মতো দু-চারটি লেখা ছাড়া ? কতটুকু পড়ি আমরা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের লেখা, বিবেকানন্দ বা আবদুল ওদুদের লেখা, কমলকুমার বা সুধীন দত্তের লেখা? এমনকি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের লেখাই আমরা কতটা পড়ি এইসব জনপ্রিয় লেখকদের তুলনায়?

সাহিত্যসহ মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বইগুলো কি জনপ্রিয় বই? দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ বইগুলো কি আপামর জনসাধারণের পড়ার জন্যে লেখা? অ্যারিস্টটল, হেগেল, মার্কস, ফ্রয়েড, ডারউইন কি জনপ্রিয় লেখকদের নাম? না। তাঁদের 'নাম' জনপ্রিয়, তাঁদের 'লেখা' নয়। তাঁদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে ধারণ করার মতো মেধার ক্ষমতা পৃথিবী আবৃত-করে-রাখা এইসব মূঢ়, বিপুল, অকর্ষিত গণনাহীন পাঠক সম্প্রদায়ের নেই। কাজেই পাঠকপ্রিয় হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁদের নেই। তাঁদের শক্তিই এ ব্যাপারে তাদের অন্তরায় । কাজেই শ্রেষ্ঠ বই সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কথাটাই গ্রহণীয় : এগুলো হচ্ছে মানবজাতির সেইসব 'শ্রদ্ধেয় শব' পাঠক যাদের দূর থেকে প্রণতি জানাতেই ভালোবাসে, কাছে গিয়ে স্পর্শ করতে চায় না। এমন যে আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে শ্রদ্ধার জিনিস তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো—এদের ব্যাপারেও কি এ কথা সত্য নয়?

বাংলাদেশে আজ মুসলমানের সংখ্যা বারো কোটি। কিন্তু তাদের কতজন কোরআন শরীফ ভালো করে পড়ে, বুঝে বা উপলব্ধি করে মুসলমান? খুব কমই তাদের সংখ্যা। এই সংখ্যা কোনোদিনই বেশি হবে না। কোরআন শরীফ পড়া, বোঝা বা আত্মস্থ করা মেধাহীন মানুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কাজেই ধর্মকে সাধারণ মানুষের চিরদিন জানতে বা আস্বাদ করে যেতে হবে যাঁরা মূল ধর্মগ্রন্থগুলোকে আত্মস্থ বা আস্বাদ করেছেন তাঁদের মুখ থেকে শুনে শুনে, ধর্ম পিপাসার স্বাদ মেটাতে হবে পরের মুখের ঝাল খেয়ে খেয়েই।

বড় লেখকরা কেন জনপ্রিয়তাকে স্পর্শ করতে পারেন না, শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা গল্প তা বুঝতে সহায়ক হতে পারে। একদিন শরৎচন্দ্রের এক

স্তাবক তাঁকে খুশি করার জন্যে বলছিলেন : 'কী অসাধারণ লেখা আপনার, কী প্রাঞ্জল! কত সহজে, কত অনায়াসে বুকের ভেতর পৌঁছে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর দেখুন রবীন্দ্রনাথ, কী দুরূহ আর কঠিন কঠিন সব লেখা, কিছুই ভালো করে বুঝতে পারি না।' ভদ্রলোকের কথাগুলো শান্তভাবে শুনে একসময় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমাকে কেন বুঝতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথকে কেন বুঝতে পারেন না জানেন?' 'কারণ : রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে, আর আমি লিখি আপনাদের জন্যে।'

৬

জনপ্রিয় লেখকরা আদৌ লেখক কি না তা নিয়ে যত সংশয়ই থাকুক একটা ব্যাপারে তাঁরা ভাগ্যবান। একসময়ে বড় লেখকেরা পাঠকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সম্মান আর ভালোবাসা পেতেন তা আজ তাদের কাছে বেহাত হয়ে গেছে। বিপুল বিত্ত, আকাশছোঁয়া খ্যাতি, জলুসপূর্ণ জীবন—সব তাঁদের মুঠোয়। আজকের এই মূঢ় গণতন্ত্রের যুগে যার যত গণসমর্থন সেই তত বড়। এই জনসমর্থন দিয়ে জনপ্রিয় লেখকেরা ভালো লেখকদের হারিয়ে দিয়েছে। তাঁদের সব মহিমা ও বৈভব আজ এঁদের দখলে। প্রায় সব দেশেই গড়পড়তা মানুষ বড় লেখক বলতে আজ জনপ্রিয় লেখকদেরকেই বোঝে। এই পাঠকদের বোধের জগৎ অসম্পন্ন বলে কাঁচা ও অপরিণত এইসব মননহীন লেখকদের মধ্যে তারা তাদের তৃপ্তির জগৎ খুঁজে পায়। ভালো লেখকেরা এখন গুটিকয় বিবরবাসী পাঠকের নিভৃত ও একান্ত আস্বাদনের বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর কিছু রচনার জনক মাত্র।

আগেই বলেছি আজকের পৃথিবীর এইসব জনপ্রিয় লেখকদের স্রষ্টা হচ্ছে একালের বিপুল পাঠকসমাজ—সংখ্যায় যারা মাছের মতো, পাখির মতো, মরুভূমির বালুর মতো, আকাশের তারার মতো, অপরিগণিত, সংখ্যাহীন। প্রযুক্তি, শিল্পায়ন এবং বিত্তের অপ্রতিহত বিকাশের হাত ধরে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বিপুল পাঠকসম্প্রদায়ের যে অবারিত উত্থান শুরু হয়েছে, দেড় শ বছর পার হতে না-হতেই তা আজ সর্বকালের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এদের সিদ্ধান্ত এবং রায়েই আজ সাহিত্যজগতের ভাগ্য নির্ধারিত। কোনো কিছুর ব্যাপারে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এদের নেই। অবিকশিত ও অগভীর এক ধরনের অকর্ষিত মানুষ এই পাঠকেরা—বোধ রুচি বা শিক্ষার দিক থেকে বেদনাদায়করকমে অনগ্রসর। এক শ বছর আগেও পাঠক ছিল একধরনের বিদগ্ধ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের নাম। আজ

ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ মানেই পাঠক। তার ভালো-মন্দের বোধ আর বিচার বিবেচনার ওপরেই আজ লেখকসম্প্রদায় অসহায়ভাবে আশ্রিত। তার নির্বাচিত লেখকই আজকের 'শ্রেষ্ঠ' লেখক। কেবল লেখক নন, কে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিবেচিত হবেন, কার গানের কোটি কোটি ডিস্ক বিক্রি হয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে বিখ্যাত আর বিত্তশালী করে তুলবে, কার টিভি অনুষ্ঠান রেটিঙে সর্বোচ্চ হয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠবে সবই তার সিদ্ধান্তে ঘটে।

এবার দেখা যাক 'এইসব' জনপ্রিয় লেখকরা কোন পাঠকদের সৃষ্টি। সন্দেহ নেই ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন বিপুলসংখ্যক মানুষই এদের স্রষ্টা। তবু প্রশ্ন : যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে তারা সবাই কি এইসব অন্তঃসারশূন্য জোলো লেখকদের একচেটিয়া উপাসক? তাদের এইসব বইয়ের ক্রেতা? এদের কিছুসংখ্যক যে এদের বই কেনেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু পরিসংখ্যান নিলেই ধরা পড়বে এই দলে পৌঢ়, মাঝবয়সী বা পরিণত পাঠকের সংখ্যা বেশি নয়। পঁচিশের কোঠায় পা দিলে মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি জেগে ওঠে, হুজুগের প্রবণতা কমে আসে, জীবন শান্ত সুস্থিত ও পরিণতিমুখী হয়ে উঠতে শুরু করে। ফলে রগরগে জোলুস যুক্তিবুদ্ধিহীন উচ্ছ্বাসে বিস্রস্ত হওয়ার প্রবণতা এদের থিতিয়ে আসে। তাহলে আধুনিক পৃথিবীর প্রতিটি দেশের এইসব কোটি কোটি বল্গাহীন প্রমত্ত উচ্ছ্বাসাক্রান্ত পাঠক-শ্রোতারা ঠিক কারা? এই মত্ততা আর উচ্ছ্বাসের প্রায় সবটাই করে প্রধানত টিনএজাররা। কেবল টিনএজাররা নয়, এই বয়সের সীমা আর একটু বেশি। তেরো থেকে পঁচিশ বছরের কিশোর তরুণেরা। এই সময় তাদের হৃদয় থাকে অপরিণত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ, মন থাকে হালকা, ফুরফুরে, উড়ে-বেড়াতে-চাওয়া, জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি থাকে উপরতলসর্বস্ব ও চপল। এর ফলে শারীরিকতার লালা ঝরানো রগরগে কোনো উপন্যাস, তরুণ তরুণীর মিষ্টি প্রেমের কোনো রোমান্টিক কাহিনী বা যে কোনো রকমের মচমচে বা চটকদার বই বেরোনোর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দোকানের দিকে ছুটে যায়।

এইসব তেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী পাঠকদের প্রিয় লেখকরাই আজকের পৃথিবীর জনপ্রিয় লেখক। এই লেখকদের স্রষ্টা আসলে এরাই। জনপ্রিয় লেখকদের বই বের হলে যারা মাতালের মতো, পাগলের মতো, জ্যৈষ্ঠের অন্ধ উন্মাদ মৌমাছির মতো বইয়ের দোকানের দিকে ছুটে যায়, অটোগ্রাফের জন্য তাদের ঘিরে অসুস্থ মাতামাতি করে, তারা মোটামুটি এরাই। এইসব অর্ধচিন্তিত অর্ধ-অনুভূত কিশোর তরুণদের উচ্ছ্বসিত দঙ্গল। পপ গানের অনুষ্ঠানে অসুস্থভাবে নেচে, চিৎকার করে, অজ্ঞান বা বিস্রস্ত হয়ে প্রিয় গায়ককে যারা হৃদয়ের অর্ঘ্য দেবার জন্য আত্মঘাতীভাবে

মরিয়া হয়ে ওঠে, তারা এরাই। আর এইসব অপরিণত কাঁচা বয়সের কাঁচা মনের চটুল পিপাসা আর জোলো চাহিদার যোগান দেওয়া লেখকই আজকের 'জনপ্রিয় লেখক'। যে পাঠকের মধ্যে বড় কিছু নেই, গভীর কিছু নেই, তার চাহিদার যিনি অকাতর সরবরাহকারী তাঁর মধ্যেও বড় বা গভীর কিছু থাকার কথা নয়। থাকলে ওই পাঠকের কাছে তাঁর প্রিয় হবার কোনো কারণ থাকত না। আজ থেকে এক শ বছর আগেও এই বয়সের কিশোর-তরুণীরা পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু আজকের মতো জনপ্রিয় গায়ক বা লেখকের জন্ম দেবার শক্তি তাদের ছিল না। কিন্তু আজ তাদের হাতে সেই শক্তি রয়েছে। আজ তাদের হাতে দেবতা সৃষ্টিকারী সেই অঘটনঘটনপটীয়সী চাবিকাঠি রয়েছে, যার নাম ক্রয়ক্ষমতা। আজকের এই তরুণরা প্রায় সবাই উপার্জনক্ষম মানুষ। তাই আজকের দিনের কনসার্টগুলোয় কোটিতে কোটিতে আছড়ে পড়ে বা কোটি কোটি সিডি কিনে একজন ম্যাডোনা বা মাইকেল জ্যাকসনের মতো দেবতার জন্ম দেওয়া এদের পক্ষে আজ আর অসম্ভব নয়।

৭

আমাদের ছেলেবেলায় এমনি জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শশধর দত্ত (মোহন সিরিজ), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (কিরীটি রায় সিরিজ)—এমনি আরও অনেকে। গরম শিঙাড়ার মতো পাঠকের টেবিলে টেবিলে তারা ধূমায়িত উষ্ণতা ছড়িয়েছেন। কিন্তু কোথায় সেসব লেখকেরা আজ? কে তাদের আজ চেনে? অনেক আগে পড়া একটা কবিতার আধো-বিস্মৃত একটা লাইন মনে পড়ছে। লাইনটা এরকম : 'মহিম হালদার স্ট্রীটে গিয়ে 'মহিম' 'মহিম' বলে কত ডাকলাম, উত্তর দিল না কেউ।' সাহিত্যের রাস্তায় আজ ওই জনপ্রিয় লেখকদের নাম ধরে যত ডাকা হোক, কেউ উত্তর দিতে এগিয়ে আসবে না। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লেখকদের এই দুঃখময় নিয়তি লক্ষ করে বেদনা অনুভব করেছেন। লিখেছেন : এইসব লেখকেরা তাদের জীবদ্দশায় পাঠকের হাতে হাতে বিবর্তিত, মুখে মুখে আলোচিত বিতর্কিত হয়ে কী তুমুল উত্তাপই না জাগায়। কিন্তু সময় একটু পাল্টে গেলেই পাঠকেরা

" ... ভেবে নাহি পায়
এই লেখা একদিন কোন গূঢ় করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।"

তা হলে দাঁড়াল, একজন লেখক 'জনপ্রিয়' হন দুটো কারণে। এক, বড় লেখকদের সমৃদ্ধ উপলব্ধিজগৎ তাঁদের ভেতর থাকে না বলে। (যার ফলে তাঁদের পক্ষে আপামর পাঠকের হৃদয়ে অনুভূত হওয়া সম্ভব হয় যা ওই জগৎ থাকলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না।) দুই, তাঁদের মধ্যে অপরিণত ও সীমিতমাত্রার শিল্পক্ষমতা থাকলেও শিল্পের উচ্চতর সম্পন্নতা থাকে না বলে (এ জন্যেই সাধারণ পাঠক তাদের আস্বাদ করতে পারে, তাঁদের ভেতরকার সামান্য শিল্পমাধুরী চেটেপুটে নিজেদের বিত্তহীন শিল্পপিপাসার স্বাদ মেটাতে পারে)। দুটো জায়গাতে শৈল্পিক অক্ষমতাই তাদের 'জনপ্রিয়' হবার কারণ। কাজেই বলা যায় লেখক হিসেবে ব্যর্থতার কারণেই—শিল্পের যে সম্পন্নতা ও গভীর উপলব্ধিজগতের সহযোগে একজন জনপ্রিয় লেখক সার্থক হন, সেইসব শক্তিমত্তার জায়গায় অনটনকবলিত হবার কারণেই—লক্ষ লক্ষ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনকারী হয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়ে।

শিল্পের এত কম পুঁজি নিয়ে খ্যাতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্মরণের পৃথিবীতে জায়গা হয় না।* তাই এই লেখকেরা কিছুদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হন। তবু যতদিন ওই লেখক সচল, যতদিন বইমেলায় একটি দুটি বা তিনটি করে বই বেরিয়ে উত্তাপে উত্তেজনায় পাঠকমহলে মৌতাত ছড়াচ্ছে, ততদিন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তো তাঁরই। সেটাই বা এমন অরুচিকর হতে যাবে কেন?

১৯৯৯

* কোনো যুগের কোনো বড় লেখক কখনও আজকের জনপ্রিয় লেখকদের (হ্যারল্ড রবিন্স জাতের) মতো জনপ্রিয় হয়েছেন এমন উদাহরণ পৃথিবীর সাহিত্যে নেই। তবু অনেক সময়ই এমন অনেক লেখককে পাওয়া যায় যাঁরা বিপুলভাবে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু ভালো লেখা রেখে যান। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এমনি একটি উদাহরণ। একশ বছর ধরে এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর 'স্মরণীয় গ্রন্থ' রয়েছে বেশ কয়েকটি। আমি তাঁকে বা তাঁর মতো লেখকদেরকে 'জনপ্রিয় লেখক'দের দলে ফেলব না। যদি কোনো লেখক কোনোভাবে স্মরণীয় সাহিত্য উপহার দিয়ে যান তখন তিনি আর 'জনপ্রিয় লেখক' থাকেন না। পাঠকের কাছে তিনি যদি জনপ্রিয়ও হন, তবু নয়। তিনি তখন 'লেখক'। শুদ্ধ লেখক। তখন শুধু 'লেখক' হিসেবেই তিনি আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ কি মৌলিক লেখক?

দিনকয় আগে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম, ওখানকার একটা গ্রন্থমেলায় বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়ে। যৌথভাবে মেলার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি ও চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষ। মেলার একপাশে একটা বেশ বড়সড় মঞ্চ, সামনে বেশ কিছু চেয়ার, সেই মঞ্চ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একেকজন লেখক বক্তৃতা করেছেন শ্রোতাদের উদ্দেশে। বারো দিন স্থায়ী মেলায় বক্তৃতা হয়েছে মোট বারেটি। বক্তৃতার ঢংটা কিছুটা অভিনব। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ঢালাও ভাষণ নয়, লেখকে পাঠকে মুখোমুখি। পাঠকেরা লেখকদের প্রশ্ন করেছেন নানান বিষয়ে, লেখকেরা সেসবের উত্তর দিয়ে পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করেছেন।

বারোদিন মেয়াদি মেলায় আমার বক্তৃতা ছিল শেষ দিনে। লেখক হিসেবে আমার ডাঁটপাট নেই। থাকার অনুকূলে কোনো কারণও নেই। কাজেই লেখক হিসেবে কথা বলার বিপদে না ফেলে পাঠক হিসেবে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেই উদ্যোক্তারা আমার প্রতি বেশি সুবিচার করতেন। তবু আয়োজকেরা অনুগ্রহ করে আমাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু বক্তৃতা শুরু করে বুঝতে পারলাম ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই। যে-সব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে তা বলার জন্যে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত থাকার তেমন কোনো দরকার নেই। মোটামুটিভাবে যে-কোনো সজাগ লোককে দিয়েই কাজটা চলতে পারে।

নানান রকম প্রশ্ন আসতে লাগল দর্শকদের কাছ থেকে। আমার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আলোকিত মানুষ কি এমনিতরো নানান প্রসঙ্গ, কেন আমাদের প্রজন্ম একাত্তরের ঘাতক দালালদের দলেবলে ছেড়ে দিয়েছে (প্রশ্নের ঝাঁজ এমনই যেন আমিই ছেড়ে দিয়েছি তাদের), কেন আমি টেলিভিশনে বলেছি সুন্দরী রমণী হিসেবে জন্মাতে পারলে আমি

নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম এমনি নানান ধরনের কথাবার্তা। সব ধরনের প্রশ্নই আছে কেবল নেই লেখালেখির বিষয়ের জিজ্ঞাসা। লেখকের কাছে জানতে চাওয়ার মতো পাঠকের প্রশ্ন। ওইসব প্রশ্ন একেবারে ছিল না বলব না, বেশ কিছু ভালো প্রশ্নও ছিল, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু কম হলেও একটা জায়গায় তারা অনন্য। তাদের ঝাল ধানী মরিচের চেয়েও কড়া। একটা দুটো প্রশ্নই মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। অনেক এলোমেলো প্রশ্নের ফাঁকে একজন প্রশ্নকর্তা এমন একটা প্রসঙ্গ তুললেন যা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে প্রায় নির্বাক করে ফেলল। তিনি বললেন, দিন কয়েক আগে একজন বক্তা (যিনি আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের একজন জাঁকালো লেখক) এই আসরে বলে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মৌলিক লেখক ছিলেন না। তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে যা কিছু বলেছেন, ইয়োরোপের লেখকেরা তাঁর অনেক আগেই সেসব কথা বলে গেছেন। কাজেই তাঁকে মৌলিক লেখক বলার সঙ্গত কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে কিছুটা বোকা হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কোন মাপের, তাঁর শক্তি বা দুর্বলতা কোথায়, তাঁর শিল্প-প্রতিভা কোথায় কোথায় উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশিত, এসব নিয়ে চায়ের পেয়ালায় অনেক ঝড় তুলেছি, কিন্তু তিনি মৌলিক নন, এ ভাবনাটা তো মাথাতেই আসে নি কোনোদিন। প্রজন্মপরম্পরায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রতিভা আর মৌলিকতার সমার্থক বলেই তো জেনে এসেছি। অনেক দিনের ভাবনা অভ্যাস আর অনুভবের ভেতর দিয়ে এ এখন আমাদের একটা চিরায়ত কুসংস্কারের মতো। মাটির মানুষের মাথার ওপর অফুরন্ত নীল অপরিমেয় আকাশ যেমন, রবীন্দ্র-প্রতিভা তো আমাদের কাছে তেমনই। আমাদের সবরকম আশঙ্কা বা সন্দেহের বাইরে। তবু এমন একটা কথা শুনে চকিতের জন্যে যেন একটু গোলমালেই পড়ে গেলাম। সত্যিও তো হতে পারে কথাটা! এমনও তো হতে পারে দেশ-বিদেশের সারস্বত সমাজ (ইয়েটস বা পাউন্ডের মতো লন্ডনের কবিগোষ্ঠীর সদস্যেরা বা নোবেল কমিটি থেকে শুরু করে এযাবৎকালের বাংলাভাষায় কথা বলা প্রায় প্রতিটি মেধাবী বা শিক্ষিত মানুষ) নিতান্তই ভুলে বা অনবধানে রবীন্দ্রনাথকে এতকাল একজন প্রতিভাবান বা মৌলিক মানুষ ভেবে এসেছেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা আমি নিজেও এতদিন জেনে বুঝে অনুভব করে বা বিশ্বাস করে এসেছি, আসলে তার অনেক কিছুই একটা বড়গোছের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। হয়তো বিরাট রবীন্দ্র কিংবদন্তিটাই আমাদের এই দরিদ্র বিশাল জাতিটার একটা অতিকায় ও বোকা কুসংস্কারের অন্য নাম, ডুবন্ত মানুষের আঁকড়ে ধরা খড়কুটোর মতো আত্মরক্ষার একটা করুণ আশ্রয়

মাত্র। নিজেকে আরও নিশ্চিত করার জন্যে কথা শুরু করার আগে রবীন্দ্রনাথের যেসব লেখাকে আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় তাঁর গোটা কয়েকের ওপর দিয়ে মুহূর্তের জন্যে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। চোখের ওপর চকিতের জন্যে ভেসে উঠল গ্রামবাংলার সোঁদা মাটির গন্ধে ভরা তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পগুলো; শেষের কবিতা, গোরার মতো উপন্যাস; ডাকঘর, রক্তকরবীর মতো নাটক; শিক্ষা, কালান্তর বা শব্দতত্ত্বের মতো বিচিত্রমুখী প্রবন্ধের বই; ছিন্নপত্র, ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র বা রাশিয়ার চিঠির মতো তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পত্রগ্রন্থ; আর সবশেষে তাঁর অসাধারণ কবিতা-জগৎ—বলাকার মতো তাঁর উচ্ছল প্রবুদ্ধ আর নিরুনমুখর কবিতাপ্রবাহ, তাঁর গানের হিরকখচিত কথামালা যেগুলোর অনবদ্যতা বিচার করে রাদিচি রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার বলতে চেয়েছেন, তাঁর কথা ও কাহিনী, কণিকা, জুতা আবিষ্কার বা হিং টিং ছট-এর মতো তাঁর অসামান্য হাস্যরসাত্মক কবিতা, বৈশাখ, বর্ষামঙ্গল বা আষাঢ়ের মতো তাঁর প্রকৃতিসজীব কবিতা, তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের বর্ষার অপরূপ ও লীলাময় রূপবৈচিত্র্য, তাঁর অনন্য ও বিস্ময়কর শিশুকবিতা, কিংবা আলাদাভাবে বর্ষার দিনে, সোনার তরী, এমনি আরও অনেক অনন্যসাধারণ কবিতা। লেখাগুলোর কথা ভাবতেই প্রশ্ন জাগল এগুলোর কোন লেখার কোন কথাগুলো ইয়োরোপের লেখকেরা আগে বলে গেছেন? আর যদি বলে গিয়ে থাকেনও তবু তা দিয়ে যদি কেউ নতুন ও অলীক শিল্পপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন তবে তাকে কি মৌলিক রচনা থেকে খারিজ করে দেওয়া যাবে? হাজার কয়েক বছর আগে পৃথিবীতে কবে কে একজন একটা প্রেমের কবিতা লিখে ফেলেছিলেন সেইজন্যে আর কেউ কোনোদিন প্রেম নিয়ে কবিতা লিখলে তা আর মৌলিক হবে না? কেমন কথা এ? শিল্পবোধের কী অপরিশীলিত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা? গ্রিক সভ্যতার মানবতা আর জীবনবাদিতার প্রেরণা থেকে একদিন জেগে উঠেছিল ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ। গ্রিক মনীষীরা এই রেনেসাঁর দু হাজার বছর আগেই তো এর মূল প্রতীতিগুলো—প্রেম, মানবিকতা আর জীবনমুখিতার বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। এ জন্যেই কি মোদ্দা দাগে বলে দেওয়া যাবে গত কয়েক শ বছরের ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর বিস্ময়কর অবদানগুলো সব সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস? শিল্পের নিজের কি কোনো স্বয়ম্ভর সত্তা নেই? শেক্সপিয়রের সাইত্রিশটা নাটকের মধ্যে এক টেমপেস্ট ছাড়া বাকি সবগুলোর কাহিনীই তো অন্যের কাছ থেকে ধার করা। এ জন্যে কি তাঁকে কেউ অমৌলিক বলেছে? মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো গ্রিক ল্যাটিন ইংরেজি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে ভারতীয় আর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সেরা সম্পদগুলো হাজার হাতে

আহরণ করেছিলেন। এ জন্যে কি তিনি অমৌলিক? তা হলে তাঁর ঐ অমিতপ্রভ ও ভাস্বর মহাকাব্যটি (গৌড়জন যাহে/ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি) কী? স্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, ওয়াল্টার স্কট, শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে গীতা উপনিষদ সংস্কৃত সাহিত্য—কার প্রভাব নেই বঙ্কিমের লেখায়। বিশ শতকের কোন ভালো ইংরেজ সাহিত্যের কোনো ভালো কবির প্রভাব নেই জীবনানন্দের কবিতায় বা চেতনাজগতে? তাই বলে কি এঁদের লেখা সব রদ্দি জিনিস? ডাস্টবিনের খাদ্য?

আমার ধারণা আমাদের সেই অদমিত ও অতি-আত্মপ্রত্যয়ী লেখক বন্ধুটি মৌলিকতা ব্যাপারটিকে খুবই অগভীর ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। হয়তো ব্যাপারটাকে চিরে চিরে আরও একটু ভালো করে দেখা সম্ভব ছিল। অন্তর্দৃষ্টির অনটনের কারণেই তা হয় নি। না হলে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক লেখক নন এমন একটা কথা এমন ঝট করে বলে ফেলতে তিনি হয়তো আরও একটু দেরি করতেন। একজন সাধারণ পাঠকও তো রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় তাঁর মৌলিকতার অনিন্দ্য ও সম্পন্ন বিভাকে টের পেয়ে যায়। আর তিনি নিজে একজন সৃষ্টিশীল লেখক হয়ে সেই অমেয় বিচ্ছুরণকে একেবারে বুঝতেই পারবেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে কি তিনি শ্রোতাদের নিছক চমকে দেবার জন্যে কথাটা বলেছিলেন? নাকি চিন্তাটা আর কারো ? পাশ্চাত্যের কোনো চিন্তাবিদগোষ্ঠীর—যাঁরা মনে করেন অনুসরণকারী সভ্যতা অগ্রবর্তী সভ্যতাকে ভাবুক বা কেবল অনুকরণই করতে পারে, নিজে মৌলিক কিছু দিতে পারে না। অনেকেই জানেন পাশ্চাত্যের অনেক মহলেই এমন একটা ধারণা এই শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রচলিত রয়েছে। তিনি কি সেই ধারণাটাকে, কোনোরকম ডান বাঁ ছাড়াই রবীন্দ্রনাথের ওপর চালিয়ে দিলেন?

অন্যের ভাঁড়ার থেকে একজন লেখক কতটা কী নিলেন না নিলেন তার ওপর লেখক হিসেবে তাঁর মৌলিকতা নির্ভর করে না। তিনি ততটুকুই মৌলিক যতটুকু নতুন জিনিস তিনি সাহিত্যের ভাঁড়ারে উপহার দেন। নতুন মানে এমন কিছু যা অপরিচিত ও অনন্য— এমন কিছু যার প্রতিরূপ সাহিত্যের অঙ্গনে আগে কখনো ছিল না পরে কখনো আসবে না, অতীত ও ভবিষ্যতের মানবজাতির মধ্যে তিনিই কেবল এই প্রতিমা রচনা করতে পেরেছেন, আর কেউ নয়, কোনোভাবেই নয়। খুঁজলে হয়তো বেরোবে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ তাঁদের লেখায় যেসব কথা বলেছেন তাঁর প্রায় সব কথাই তাঁদের আগের কোনো না কোনো লেখক কোনো না কোনো সময় বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যের এই উত্তরাধিকার মৌলিকতার দাবি থেকে তাঁদেরকে খারিজ করতে পারে নি। কেননা

সাহিত্যের ইতিহাস মূলত প্রসঙ্গের ইতিহাস নয়, প্রকরণের ইতিহাস। আধেয়ের নয় আধারের ইতিহাস।'কী বলা হল' তা দিয়ে সাহিত্য-মানের উঁচু-নিচুর পরখ চলতে পারে কিন্তু আদৌ তা সাহিত্যের তালিকায় নাম ওঠাতে পারল কি না তা নির্ভর করে 'কেমন করে বলা হল' তার ওপরেই। ওই লেখকেরা সবাই মৌলিক, কেননা তাঁদের লেখার শব্দ ছন্দ উপমার অলীক সমাবেশের ভেতর তাঁরা এমন অলীক ও অনন্য কিছু উপহার দিয়েছেন যা কেবল অপরিচিত ও নতুন নয়, সেগুলো তাঁরা উচ্চারণ করেছেন পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো, যা তাঁদের আগের বা পরের কেউ কখনো ঠিক ওভাবে উচ্চারণ করেন নি, করবেনও না। এ যদি না হত তবে সাহিত্যে মৌলিক বলে কিছু থাকত না। জীবনের কয়েকটা মোদ্দা আবেগের বাইরে সাহিত্যের বক্তব্য অংশে আসলে কিছুই থাকে না। (থাকলেও তা দর্শনে থাকে, সাহিত্যে নয়।) সাহিত্যের কাজ হল এইসব একঘেয়ে স্থূল অগ্রহণযোগ্য ও ক্লেদাক্ত আবেগগুলোকে প্রকরণের অবাক সামঞ্জস্য রচনার ভেতর দিয়ে অনির্বচনীয় ও চিরকালীন প্রতিমায় মূর্ত করে তোলা।

২

রবীন্দ্রনাথের মতো বড় লেখকদের মৌলিকতা বুঝতে পারা আরও একটা কারণে কিছুটা কঠিন। সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা বড় লেখকদের মৌলিকতা থেকে কিছুটা আলাদা। সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা ফ্ল্যাশ বাল্বের আলোকচ্ছটার মতো—তীব্র, ক্ষিপ্র, চোখ-ধাঁধানো। অনন্যতার প্রখর চাবুকে মুহূর্তের জন্য চোখকে অন্ধ করে দিতে পারাতেই তার সার্থকতা ও সাফল্য। এ জন্যে চোখে না পড়ে তার উপায়ই নেই। জীবনের সমগ্রতা জুড়ে শিল্পের আদিগন্ত ও অফুরন্ত আগুন তাঁদের ভেতর নিরন্তরভাবে প্রজ্বলিত নয় বলে আত্মঘাতী দেশলাইয়ে জীবন জ্বালিয়ে শিল্পের প্রতিমা উপহার দিতে হয় তাঁদের। বঞ্চিত উপেক্ষিত মানুষেরা যেমন তাদের পরাজিত জীবনের যাবতীয় আক্রোশকে জিভের ক্ষিপ্ত তীব্র প্রতিবাদের ধারালো ছুরির মুখে কেন্দ্রীভূত করে চিৎকার করে চলে তেমনি সাধারণ লেখকেরাও অস্তিত্বের সমস্ত শক্তিকে শিল্পের সংকীর্ণ সূচীমুখে কেন্দ্রীভূত করে জ্বলে ওঠেন। এই উজ্জ্বলতা এমনই চাক্ষুষ এবং পরিত্রাণহীন যে তাকে চিনতে আমাদের কোনোরকম ভুল হয় না। লেখকদের প্রথম উজ্জ্বল সাড়াজাগানো লেখাগুলোর মতো তীব্র এরা, প্রথম প্রেমের মতোই যন্ত্রণাদায়ক ও অনির্বচনীয়। বড় লেখকদের লেখা কিন্তু এত উজ্জ্বল নয়। দূর

আকাশের বিশাল নক্ষত্রের মতো এরা, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ। এঁদের রচনায় চোখ নষ্ট করে দেওয়া তীব্রতা বা নির্মমতা নেই। সাধারণ লেখকদের তুলনায় অনন্ত কোটি গুণ আলো এদের মধ্যে, অসীম বিস্তারী দাউদাউ অগ্নিবিম্ব, তবু খালি চোখে চাইলে মনে হবে হয়তো ফ্ল্যাশ বাল্বের চেয়েও কম আলো এখানে এতই নিরীহ, এতই প্রতারক। কেন এই বিভ্রম? কারণ, যতবড় অগ্নিজগতকেই সে ধারণ করুক, নক্ষত্রদের মতোই সে আছে আমাদের চাইতে অনেক দূরে, এত দূরে যে খালি চোখে আগুনের সেই প্রলয়ঙ্করী লক্ষকাণ্ডের স্বরূপ জানা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা জানতে হলে আমাদের চাই একটি ভালো মানের টেলিস্কোপ। এই টেলিস্কোপ যে খুঁজে নিতে পারবে না নক্ষত্র তার কাছে ফ্ল্যাশ লাইটের চেয়েও মৃদুতর ও অর্থহীন ব্যাপার বলে মনে হবে। বড় লেখকদের অবস্থানও তেমনি–আমাদের প্রাকৃত ও অকর্ষিত সাহিত্যবোধ থেকে অনেক ওপরে। সাহিত্যরুচির উচ্চতর বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলন ছাড়া তাঁদের প্রকৃত শক্তিকে শনাক্ত করা সত্যি সত্যি কঠিন। করতে গেলে আমাদের ওই লেখক বন্ধুটির মতো রবীন্দ্রনাথের মতো একজন নাক্ষত্রিক লেখককে অনায়াসে অমৌলিক বলে আখ্যায়িত করার মতো অতিসরলতার আশঙ্কা থেকে যেতে পারে।

এ ধরনের বিভ্রান্তি যে কেবল সাহিত্যশিক্ষার অভাব থেকেই হয় তা নয়, সাহিত্যবোধের জন্মগত প্রতিবন্ধিতার কারণেও এটা ঘটতে পারে। শেক্সপিয়ারের শক্তিমত্তা অনুধাবনে টলস্টয়ের মতো মহান লেখকের অক্ষমতা, মিলটনের কাব্য-প্রতিভা বিচারে টি. এস. এলিয়টের ভ্রান্তি, মাইকেলের বলীয়ান জীবনাবেগ অনুধাবনে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও বর্ষীয়ান বুদ্ধদেবের অপারগতা, জীবনানন্দের কবিত্বের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অননুমোদন এমনি সব গোলমালের উদাহরণ।

ছোট লেখকের সঙ্গে বড় লেখকের আর একটা ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। সেটা ভালো লেখার অতিপ্রজতায়। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আল মাহমুদ, যার কবিতা বাঙালি পাঠক বেশ কিছুকাল পড়বে বলে আমি মনে করি, একবার, সেই সত্তরের দশকের প্রথম দিকে, নিজের আশঙ্কিত মনকে স্বস্তি দেবার জন্যেই হয়তো, একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, 'মান আর নাই মান, রবীন্দ্রনাথের মতো অন্তত *একটা ভালো কবিতা* তো লিখেছি।' উত্তরে আমি তাকে বাংলা লোককথার নাককাটা রাজার গল্পটা স্মরণ করতে বলেছিলাম। বলেছিলাম: গল্পটায় আছে—একটা টুনটুনি হঠাৎ করেই একটা টাকা পেয়ে গিয়েছিল। সেই অহঙ্কারে সে রাজার সামনে দিয়ে উড়ে উড়ে বলে বেড়াতে লাগল, রাজার ঘরে যা আছে / আমার ঘরেও তা আছে। কথাটা মিথ্যা নয়। রাজার ঘরে টাকা আছে, তার ঘরেও টাকা আছে। তা হলে রাজা আর টুনটুনির পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানে যে টুনটুনির

একটা আছে, কিন্তু রাজার আছে হাজার। একই টাকা, কিন্তু রাজা ঐ হাজার দিয়ে রাজা, টুনটুনির চেয়ে অনেক অনেক বড়।

ভালো কবিতা বড় কবিদের মতো ছোট কবিদেরও লিখতে হয়। অন্তত একটি স্মরণীয় কবিতা না লিখে কেউ 'কবি' হয় না। ওতে 'কবিকে পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে। বেশি সংখ্যক স্মরণীয় কবিতা লিখে, অনাবিষ্কৃত হওয়া যেতে পারে, কবি নয়। তা হলে একজন বড় কবি কী দিয়ে বড়? হৃদয়জগৎকে প্রদেশ অনেক বেশি সংখ্যায় উদ্ঘাটন করে, উপলব্ধির সমুদ্র অনেক বেশি অবগাহন করতে পেরে। আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই সংখ্যা গণিতের সংখ্যা নয়, গুণের সংখ্যা। কত লক্ষ লাইন লিখে কত বিপুল আকৃতির রচনাসম্ভার তিনি প্রকাশ করলেন তার ওপর কোনো কিছু নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে কত বেশি অর্থহীন মর্মর খণ্ডকে কতগুলো শিল্পিত তাজমহলের মধ্যে তিনি ধারণ করতে পারলেন তার ওপর।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসফল রচনার বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, গভীরতা ও সংখ্যা প্রমাণ করে যে তিনি একজন বড় লেখক; বিস্তর রজতমুদ্রার টাকশালওয়ালা রাজাদের দলের লোক। তাঁর 'লোকশ্রুত অবদানও অনেক। আধুনিক বাংলাভাষার জনক তিনি। আজকের বাঙালি জাতি যে ভাষায় কথা বলে এবং ভবিষ্যতে বলবে, তার সৃষ্টি তাঁর হাত থেকেই। এ ছাড়া কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, প্রবন্ধকার—এমনি আরও যেসব অঙ্গনে তাঁর অনন্য শিল্পসাফল্য রয়েছে সেসব বারে বারে উল্লেখ করে বিরক্তি বাড়াতে চাই না। এ প্রসঙ্গে কেবল একটা কথা নিবেদন করতে চাই : কবে কতদিন আগে ইয়োরোপের কোন লেখকেরা কী সব আকাশ-পাতাল কথা বলে গিয়েছিলেন তার খেসারত হিসেবে তাঁর এইসব অবিশ্বাস্য শিল্পসিদ্ধিগুলোকেও আমরা যদি মৌলিকতার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করি তবে তাঁর প্রতি কি খুব সুবিচার করা হবে?

৩

মৌলিকতা দু ধরনের : সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা আর বড় লেখকদের মৌলিকতা।

আগেই বলেছি সাধারণ লেখকেরা খুবই তীব্র ও উজ্জ্বল। এঁরা বিশুদ্ধভাবে মৌলিক। এঁদের অস্তিত্ব অনন্য, একক। কবি যেমন বলেছেন, 'আমার মতন নাই কেউ আর' তেমনি। কিন্তু আগেই বলেছি বড় লেখকদের মৌলিকতা অত জ্বলজ্বলে নয়। অত স্বতন্ত্র নন এঁরা। নন অমন চাক্ষুষ ও প্রখর। ছোট

লেখকদের তুলনায় এঁরা অনেক বেশি জীবনের মতো, প্রকৃতির মতো। এঁরা সহজ, অনায়াস। সহজ বলেই এঁরা এত সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেন, সকলের হয়ে উঠতে পারেন। এঁরা তাই হয়ে উঠতে পারেন সমস্ত মানবজাতির লেখক, বিশ্বজনের লেখক। সংকীর্ণ কুঠুরির তীব্র একাকিত্বের কথা এঁরা বলেন না, বলেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল মানবতার কাহিনী। তাই সকলের কাছে এঁরা অনুভবগম্য, বোধগম্য, গ্রহণীয় ও আদরণীয়। এই জন্যেই এই দলের প্রতিনিধি বলতে পারেন :

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

সাধারণ লেখকদের মতো এঁরা অত বিশুদ্ধ নন। এঁদের মধ্যে অনেক খাদ থাকে, ধুলোমলিনতা থাকে। মহৎ শিল্পের কারবার সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে। ঐ শিল্পীরা উপহার দেন পরিপূর্ণ জীবন। জীবনের গভীরে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে নির্জলা শুভর সঙ্গে অনেক ক্লেদও এঁরা সঙ্গে করে তুলে আনেন বলে সাহিত্য থেকে এই আবিলতাকে এঁরা কিছুতেই এড়াতে পারেন না। এঁরা যা দিতে পারেন তার নাম ক্লেদজকুসুম। তাই অম্লানশুদ্ধতা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব একমাত্র সাধারণ লেখকদের পক্ষেই। যে জীবনকে বড় লেখকেরা সাহিত্যে উপহার দেন তা যেমন বলীয়ান আর পরাক্রান্ত তেমনি জন্মান্ধ ও আদিম। বিশুদ্ধতার চালুনিতে ছেঁকে তোলা শো-কেসের শীতল প্রাণহীন অনন্য সৌন্দর্য সে নয়। রক্তের উষ্ণতায় তা গন্ গন্-করা। খাদ থাকে বলেই এঁদের শিল্প অত মজবুত, অত দীর্ঘায়ু। সময়ের উত্তাল হিংস্র ঢেউয়ের আক্রোশকে অত অনায়াসে পার হয়ে যায়। কেবল খাদ নয়, বড় শিল্পে, ছোট শিল্পের তুলনায়, ভুলভ্রান্তিও বেশি। সেখানে শক্তিমত্তা বেশি বেশি ভুলভ্রান্তি সেখানে বেশি থাকে। শক্তির কারণেই থাকে। কিন্তু ছোট শিল্পের কারবার স্বল্প শক্তির পুঁজি দিয়ে। ভুল করার মতো শক্তিই নেই এর ধমনীতে; থাকলেও পরিসর কম বলে শুধরে নেবার অবকাশ আছে। তাই শুদ্ধতা হচ্ছে তার প্রাণ। ওটুকু হারালে তা বাঁচবে কী দিয়ে? তাই ছোট সাহিত্য এমন নির্ভুল, নিখাদ আর পরিশ্রুত। জীবনের সবরকম ক্লেদ অশুদ্ধতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে সতর্কভাবে তফাতে রেখে একটা পরিপাটি স্নিগ্ধ বিচ্ছিন্নতার ভেতর অপলক উজ্জ্বল ফুলের মতো সে ফুটে থাকে। এই অতিপরিশীলনের কারণে বিশুদ্ধ কবিতা সহজ হয় না, সর্বজনীন হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণটা সত্যি সত্যি অসাধারণ। বড় সাহিত্যের মাঝে থাকে উত্তমের গুণ, মহৎ ও তুচ্ছ, চোর ও সাধু, ঠগ ও পুণ্যবান সবার সঙ্গে তার অবারিত চলাফেরা। তার মধ্যে সবাই রয়েছে বলে সবাইকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মধ্যম তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ছোট। সত্যিকার অর্থে মধ্যম কে? মধ্যম সে-ই যে আসলে অধম কিন্তু পরে আছে উত্তমের বেশবাস, ভুল পরিচয়ে সবাইকে ঠকিয়ে চলেছে। সাহিত্যের জগতের মধ্যমও একই রকম? আসল হিসেবে সে ছোট, কেননা তার হৃদয়জগতে জৈবতাড়নার সেই লোকশ্রুত বিশাল উথালপাতাল নেই কিন্তু বেশবাসে সে পালিশ-করা, নৈপুণ্যে পরিপাটী পুরোপুরি সযত্নচর্চিত—অর্থাৎ ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে উত্তম। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শুদ্ধতা' মাঝারিত্বের পরিচয়বাহী, শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতক নয়। তাই 'শুদ্ধতম কবি' শ্রেষ্ঠ কবি নয়।

ফিরে ফিরে আবারও যেখানে ফিরে আসছি তা হল, সাধারণ লেখকদের মৌলিকতা বড় লেখকদের তুলনায় অনেক নির্জলা ও বিশুদ্ধ। জ্বলজ্বলে ক্ষুরধার এর দীপ্তি। ছোট পরিসরের মধ্যে মৌলিকতার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে এ তৈরি হয় বলে, চশমার কাচে রোদের কেন্দ্রীভূত তীব্র তাপের মতো তা অনায়াসে কিছুকালের জন্যে পৃথিবীর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ভারী ঝকঝকে আর দ্যুতিময় এ। ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ, শারীরিক কামনায় গোবিন্দ দাস, মধ্যবিত্তের যন্ত্রণায় সমর সেন, গ্রামীণ অন্তরঙ্গতায় জসীমউদদীন, প্রলেতারীয় চেতনায় সুকান্ত বা সিদ্দাবাদের ফররুখ আহমদ এমনি বিশুদ্ধ ও মৌলিক। উজ্জ্বল, অনন্য। কিন্তু বড় মৌলিকতা বিস্তৃত গভীর বিশাল জায়গার ওপর ছড়িয়ে যায় বলে তা অনেক নম্র ও সহনীয়। তাকে শনাক্ত করা দুরূহ। যেন আর দশজন লেখকের মতোনই তা, কেবল একটি জায়গায় আলাদা। সে একটু প্রতারকরকমে উঁচু। মাইকেল, জীবনানন্দ, নজরুল, মোহিতলাল বা সমর সেন—এঁদের লেখা পড়তে গিয়ে যে কেউ প্রথম পরিচয়েই টের পেয়ে যান এঁদের মতো একটা লাইনও লেখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে কেন যেন আশা জাগে, মনে হয় আমিও হয়ত লিখতে পারব অমন কিছু, হয়তো লিখেও ফেলা যায় পাঁচ সাত লাইন, কিন্তু অষ্টম লাইনে গিয়ে ধরা পড়ে ভুল নম্বরে ডায়াল করা হয়ে গেছে। দেখতে সাদাসিধা মনে হলেও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে আত্মস্থ ও অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একই সঙ্গে এ লেখা কাছের এবং দূরের, সর্বসাধারণের তবু সর্বসাধারণ যাকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ বা ক্ল্যাসিক লেখকদের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে সেই গুণ, যাকে বুদ্ধদেব বসু চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রতারক সরলতা' বলে। এঁদের জীবন

শক্তিমন্ত বলে এঁদের উচ্চারণও সর্বজনীন ও সহজ। শ্রেষ্ঠ লেখকদের এই আপাতসরল স্বভাবটি সম্বন্ধে অবহিত না থাকায় আমাদের সেই লেখক বন্ধুটি রবীন্দ্রনাথের রচনার এই সহজ ব্যাপারটিকে হয়তো এভাবে কমদামি বা পড়ে পাওয়া আটপৌরে ব্যাপার বলে ঠাউরে নিয়েছেন। চেতনার ছোট পরিসরে তাঁদের মৌলিকতা কেন্দ্রীভূত নয় বলে তাঁদের মৌলিকতা ঝট করে খুঁজে বের করা কঠিন। তাঁদের মৌলিকতা থাকে তাঁদের সমগ্রতায়; পুরো অবয়বে ছড়িয়ে গড়িয়ে। ছোট লেখকদের মতো আলাদা করে চোখে পড়বার জিনিস তা নয়। এই জন্যে ছোট লেখকদের বুঝতে হলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা পড়তে হয় আর বড় লেখকদের বুঝতে হলে পড়তে হয় তাঁদের রচনাসমগ্র। এর মানে এই নয় যে এঁদের লেখার সামগ্রিকতার ভেতর প্রতিভার অসামান্য শক্তিমত্তা প্রদীপিত নয়। দস্তয়েভস্কির অনিঃশেষ প্রচণ্ডতা, কালিদাসের শক্তিমান চিত্রগুণ, স্যাফোর জান্তব হাহাকার, হোমারের প্রচণ্ড পেশিবহুলতা, হাফিজ বা রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় হৃদয়মাধুরী প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে চলে যে তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ কবিরা তাঁদের ছোট্ট উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি দিয়ে সহজেই চিহ্নিত হয়ে যান—যেমন অমুক দেহবাদের কবি, অমুক ছন্দের জাদুকর, অমুক গণমানুষের কবি, অমুক দাম্পত্যপ্রেমের কবি, কিন্তু বড় কবিদের ঠিক এভাবে কোনো বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁদের একজনের ভেতর অনেকজন অসাধারণ কবির শক্তি এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে কোনো একটি বা দুটি পরিচয়ে তাঁদের শনাক্ত করা অসম্ভব। আসলে এঁদের মৌলিকতা কোনো একটি বা দুটি তীব্র বা দ্যুতিময় গুণের ভেতর থাকে না—থাকে সামগ্রিক সমন্বয়ের ভেতর। সাধারণ কবিদের মতো তাঁরা চাক্ষুষ অর্থে মৌলিক নন, যুগ যুগের অসংখ্য কবির মৌলিকতার এঁরা যোগফল। সভ্যতার বহুকালের ঐতিহ্যকে ধারণ করতে পারেন বলে এঁরা বড়। আপাতমৌলিকতা খুঁজলে রবীন্দ্রনাথকে অতটা উজ্জ্বল মনে নাও হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এত বড় তার কারণ তাঁর মধ্যে গত তিন হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হাজার বছরের ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি শক্তিশালী আবেগে বাঙ্ময় ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এসব লেখকেরা বড় এঁদের ধারণক্ষমতায়, মানবজাতির যুগযুগান্তরের শিল্পপ্রয়াসকে উচ্চতর ব্যাখ্যা দেবার সামর্থ্যে, সহস্র চক্ষুতায় এবং আদিম ও অপরিমেয় শক্তিমত্তায়। কাজেই ছোট লেখকদের মতো এঁদের ডালপাতার আড়ালে আবডালে মৌলিকতা খুঁজে বেড়াতে গেলে হতাশ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

শিল্পের বাস্তব

'পোস্ট মাস্টার' গল্প লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখনই একবার লিখে ফেললেন যে রতনের বয়স তেরো বছর, সে একজন অজ পাড়াগাঁর মেয়ে, সে-মুহূর্ত থেকে ওই গল্পের জন্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার দরকার মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে যে অনুভব করবে, ভাববে, সম্ভাবনায় উৎকর্ণ ও কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে জীবনকে পায়ে পায়ে রচনা করবে তার নাম রতন। এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাজ একটিই : ওই মেয়েটিকে অনুসরণ করে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাওয়া। কৈশোর-যৌবনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানো অজ পাড়াগাঁর তেরো-চৌদ্দ বছরের একজন উন্মুখ অবোধ কিশোরী যা ভাবতে পারে, করতে পারে, অবোধ অস্ফুট অপরিণত আবেগের কারণে বিশ্বচরাচরে যতরকম দুর্দৈবের হাতে বিপর্যস্ত হতে পারে ইচ্ছামতো তাই সে একে একে করতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দায়িত্ব হল রতনের সেই স্বেচ্ছাযাত্রাকে, তার প্রতিটি পদপাতের ইতিহাসকে বিশ্বাস্ত তুলিতে এঁকে চলা। রতনকে তিনি পথ বাতলাতে পারবেন না, আদেশ-নির্দেশ দিতে পারবেন না। বিপদ বিপর্যয়ের মুখে সতর্ক করতে পারবেন না। কেবল নীরবে অনুসরণ করবেন। এই অনুগমনের পথ ধরে ওই গল্পে যার ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে সেটিমূলত রবীন্দ্রনাথের নয়, রতনের। রতন যত উজ্জ্বল আর রক্তপ্রাণময় মানুষ হবে, রবীন্দ্রনাথ ততটাই সফল।

এইভাবে শিল্পী জীবনের কাছে জিম্মি। জীবন ঠিক যেরকম তাকে মোটামুটি সে হিসেবে আঁকাই তাঁর কাজ। এই জীবনকে বাঁকিয়ে, দুমড়ে, ভেঙেচুরে নিজের ইচ্ছেমতো করে গড়েপিটে অন্য কিছু বানিয়ে নেবার অধিকার তাঁর নেই। এমনটা করলে তিনি বড়জোর নিজের ব্যক্তিগত ছবিটুকুই এঁকে যেতে পারবেন। কিন্তু বাইরের বিশ্বচরাচরের বিশাল অবয়ব

থেকে যাবে তাঁর নাগালের ওপারে। ফলে তিনি নিতান্তই ছোট মাপের শিল্পী হয়ে দাঁড়াবেন।

এজরা পাউন্ড হয়তো এ জন্যেই একবার লিখেছিলেন, খারাপ শিল্পী মাত্রেই অপরাধী, কেননা, তারা জীবনের ভুল ছবি তুলে ধরেন। একজন শিল্পী তো কালের দলিলরক্ষক, রেকর্ডকিপার। একজন প্রকৃত শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর কাল ও পরিপার্শ্বের বিশ্বস্ত ছবিকে আগামী পৃথিবীর সজীব অনুভবের জন্যে রেখে যান। এই দরকারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যা আঁকতে যাচ্ছেন তার ওপর যদি ফিরে ফিরে কেবলই নিজের ছোপ লাগাতে থাকেন, তবে আগামীকালের পৃথিবী তাঁর লেখার ভেতর তাঁকে খানিকটা পরিমাণে খুঁজে পেলেও তাঁর অব্যবহিত পৃথিবীকে খুঁজে পাবে না। একজন শিল্পী যা কিছুই আঁকেন তাকে তাঁর ভিতরকার রুচি ও পরিশীলন দিয়ে তিনি আলোকিত করে তুলতে পারেন, তাঁর জ্বলন্ত বাস্তববোধের স্পর্শে বিশ্বাসযোগ্য ও রক্তমাংসময় করে তুলতে পারেন, উচ্চায়ত মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টির সংক্রামে তাকে বড় করে তুলতে পারেন, কিন্তু তার সত্য পরিচয় থেকে তাকে সরিয়ে অন্য কিছু করে তুলতে পারেন না। এটা করতে গেলে শিল্প শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

বাংলা কথাসাহিত্যে আমি এ যাবৎ দুজন লেখকের কথা ভাবতে পারি যাঁরা তাঁদের চারপাশের জীবন ও পৃথিবীকে বিশ্বস্তভাবে আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাহিত্যের বাকি প্রায় সবাই জীবনকে আঁকতে চেয়েছেন জীবনের চেয়ে সুন্দর বা কদাকার করে। এঁদের চোখে সুন্দরতর বা কুৎসিততর পৃথিবীর একটা করে স্বপ্ন ছিল। শিল্পরচনার সময় সেই স্বপ্ন থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র হয়ে একালের শীর্ষেন্দু পর্যন্ত প্রায় সব লেখকই এই ধারার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে একটা ছোট্ট ও চমৎকার ইঙ্গিত করেছিলেন :

'রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়-ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতের অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।'

জীবনকে অতিক্রম করার নামে জীবনকে ওইসব লেখকেরা এমনি বাস্তবতা থেকে নিয়ে সরিয়ে আনেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলো থেকে আরম্ভ করে সামাজিক উপন্যাসগুলোর সবখানে তাঁর এই স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটোকে দেখতে পাওয়া যায়। বড় বেশি

তিনি খুঁজেছেন এই পৃথিবীর কাছে যা কোথাও নেই অথচ যা থাকলে তিনি খুশি হতেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতো উপন্যাসও এই আদর্শায়িত দৃষ্টির আক্রমণ এড়াতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের পৃথিবীও মোটামুটি তাঁর আদর্শেরই পৃথিবী। এই জন্যেই তা একরৈখিক ও অচিরকালীন। একদিকে তুচ্ছ উজ্জ্বল বাস্তবতা অন্যদিকে অপ্রাপনীয় আদর্শলোকের অভিঘাতে তা মাঝারি। এইরকম ঘটনা বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব ঔপন্যাসিকের বেলাতেই ঘটেছে। এই ধারার প্রথম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি পাঠককে বলছেন, আমি জীবনের শিল্পী। এই জীবনের বিশ্বস্ত দলিল আমাকে রেখে যেতে হবে। জীবন যেমনটি তা যত নির্মম ও যন্ত্রণাদায়ক হোক, তবু ওই জীবনই আমাকে আঁকতে হবে—তার বেশিও না, কমও না। ওই সত্যটুকুর জন্যেই আমি শিল্পের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'শেষের কবিতা'র অমিত এবং লাবণ্যের বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক, কিন্তু জীবন যদি অমন রক্তপাতীই হয় তবে কী করার আছে লেখকের—নিঃশব্দ মূক বেদনায় জীবনের ওই অবধারিত প্রতিকৃতি এঁকে যাওয়া ছাড়া?

ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের 'পোস্ট মাস্টার' গল্পটি। রতনের বয়স তেরো বছর। এরই মধ্যে কখন অগোচরে যে তার ভেতর কৈশোরকে সরিয়ে যৌবন ঘাতকের মতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে জানে নি। যখন টের পেয়েছে তখন এক বিশাল নিঃসঙ্গতার ভেতর নিজেকে সে আবিষ্কার করেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও অসহায় অবস্থায়।

পোস্ট মাস্টারও প্রথমে রতনের অনুভূতিকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। বুঝেছেন যখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে তখন :

"যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কতো বিচ্ছেদ, কতো মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

পোস্ট মাস্টারের মনে হয়েছিল, 'ফিরিয়া যাই', এ-অনুভূতি কেবল পোস্ট মাস্টারের নয়, প্রতিটি মানুষেরই, তাদের প্রতিটি বিদায় মুহূর্তের। পিছে ফেলে যাওয়া পৃথিবীকে অনেক বড় বলে মনে হয় তখন। তাকে আর একবার পাবার

কথা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন এই মুহূর্তের এই আকাঙ্ক্ষাটুকুর মধ্যে কোনো খাদ নেই। কিন্তু এও জানেন যে, ব্যাপারটা যত আকাঙ্ক্ষিতই হোক ফিরে যাওয়া যায় না। সামনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ব্যাপ্ত পৃথিবী তখন অবারিত বিপুল আমন্ত্রণে ডাকছে। পালে বাতাস পেয়েছে, বর্ষার স্রোত খরতর হয়ে বইতে শুরু করেছে, 'গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান' দেখা দিয়াছে, এবং 'নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয়' ইতিমধ্যেই হয়েছে: 'ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' রবীন্দ্রনাথ জানেন মানুষ আন্তরিকভাবেই পেছনে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু সে ফেরে না। জীবনের অগ্রসরমান প্রয়োজন তাকে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। ('এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত/এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেইমত'।) রবীন্দ্রনাথ জানেন জীবন এমনি নিষ্ঠুর ও রক্তদীর্ণ। এই সত্য মৃত্যুর মতো, বিদায়ের মতোই নির্মম। তাই তিনি পোস্ট মাস্টারের নৌকাকে পদ্মার বিস্ফারিত জলধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন নি।

একটা ভেদাভেদহীন বাংলা সিনেমা হলে এমন জায়গায় হয়তো উল্টো রকমের একটি ছবিই পেতাম। দেখতাম, সেই মুহূর্তে—যখন পোস্ট মাস্টারের মনে হয়েছে 'ফিরিয়া যাই'—নায়ক আবেগের উদ্দীপনায় ঘটিয়ে বসত একান্ত ঈপ্সিত সেই ঘটনাটিই : উদ্বেল আগ্রহে জ্বলে উঠে হেঁকে উঠত : মাঝি, নৌকা ফেরাও। তার 'নৌকা ফেরাও' কথাটা হয়তো শব্দগ্রহণ যন্ত্রের বিস্ময়কর কৌশলে উত্তাল পদ্মার বুককে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে প্রতিটা দর্শকের মনে আশার কাঁপন জাগাত। তার পরেই হয়তো দেখা যেত উদ্দাম বাতাস লাগা স্ফারিত পালে নৌকা ছুটে চলেছে ঘাটের দিকে। আর সেইসঙ্গে একবার পোস্ট মাস্টারের আকুল চেহারা, একবার রতনের উজ্জ্বল মুখ ঘনঘন ক্লোজআপে দেখতে থাকতাম আমরা এবং তারপরই হয়তো দেখতাম আমাদের অন্তরের সবচেয়ে কাম্য সেই ছবিটি : নৌকা ঘাটে লাগার আগেই 'আমি এসেছি রতন' বলে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে রতনের দিকে পোস্ট মাস্টারের মরিয়া ছুটে যাওয়া এবং একই গতিতে নদীর ধারে অপেক্ষমাণ আকুল রতনের এগিয় আসা এবং তার পরেই উভয়কে উভয়ের বুকে আছড়ে পড়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ উদ্দাম ও পরিতৃপ্ত দৃশ্য। সিনেমা হলের দর্শকদের তুমুল প্রবল করতালির মধ্যে মিলনদৃশটি উদযাপিত হত এভাবেই। চলচ্চিত্রের পরিচালক দৃশ্যটিকে এভাবে আঁকতে চাইতেন, কারণ এটাই আমাদের সবার চাওয়া। জীবন এমনটি হলেই আমরা খুশি। কিন্তু জীবন যে আমার চাওয়া পাওয়ার তোয়াক্কা করে না, জীবন যে নিজে একটা নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম পৃথিবী—এটা কেবল বড় শিল্পীরাই টের পান। বড় শিল্পী হলেন ক্রিকেট মাঠের আম্পায়ার। যাঁর সামনে দিয়ে তাঁর দেশের

দলের একের পর এক ব্যাটসম্যান আউট হয়ে মাঠ থেকে চলে যাবে, অথচ হাতের নিঃশব্দ ইশারায় বিদায় ঘোষণা ছাড়া তার করণীয় কিছু থাকে না। এই জন্য জীবনের ভুল ছবি তাঁদের কাছ থেকে আমরা কম পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথার' কুসুমকে একদিন চলে যেতে হয়। আমাদের সবার বেদনাকে পায়ে দলেই সে যায়। না গিয়ে সে কী করবে। কুসুম যে তখন আর নেই। তার হৃদয় যে মরে গেছে। এই ধরনের নিষ্ঠুর বাস্তবকে নিরঞ্জন চোখে আঁকতে পেরেছেন বলেই জীবনের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছবি পাওয়া গেছে এঁদের হাত থেকে। এরই পাশাপাশি একটা ছোট্ট উদাহরণ—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষ্মীকে তুলনা করলে শক্তির অনটন স্পষ্ট হবে। কৈশোরে রাজলক্ষ্মী যেমন অপরিণতভাবে বইচি ফুলের মালা দিয়ে শ্রীকান্তকে, তার অজান্তে, চিরকালের মতো বরণ করে নিয়েছে এবং পরে, উপন্যাসের পরিণতিতে, পরের জন্মে শ্রীকান্তকে পাওয়ার ইচ্ছায় আকুল হয়েছে তা থেকে টের পেতে দেরি হয় না পুরো উপন্যাসের ভিত্তিকে তা কী অবাস্তবতা আর অপরিণতির ভেতর নিক্ষেপ করেছে। আমরা ঈপ্সিতকে পেয়েছি কিন্তু হারিয়ে গেছে শিল্প।

১৯৯৫

বাংলা সাহিত্যে অন্তত একটি পুরুষ চরিত্র চাই

জার্মানরা তাদের দেশকে বলে পিতৃভূমি, আমরা বলি মাতৃভূমি। গোগলের 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে বুলবার বীর সন্তান অস্তাপ মৃত্যুর আগমুহূর্তে 'দুর্বল মায়ের ক্রন্দন-অনুশোচনা শুনতে চায় নি। শুনতে চায় নি কোনো পত্নীর উন্মত্ত চিৎকার যে নিজের কেশ উৎপাটিত করে তার শুভ্র বক্ষে আঘাত করবে। সে শুধু দেখতে চেয়েছিল দৃঢ়চিত্ত পুরুষকে যার বিজ্ঞ বাণী তাকে দেবে মৃত্যুর পূর্বে শক্তি ও সান্ত্বনা।'

কিন্তু আমরা বেধড়ক মায়ের মুখে 'মাগো বাবাগো' বলে চ্যাঁচানোর সময় সম্ভ্রমবশে মায়ের পাশে বাবাকে কিছুটা কুণ্ঠিত স্থান দিলেও রোগশয্যার একাকিত্বে বা নিঃসঙ্গ জীবনের অসহায়তম মুহূর্তে যার নামটি আশ্বাস এবং নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে উচ্চারণ করতে ভালোবাসি, সেই প্রিয় নামটি মায়ের। আজো বাঙালির কাছে মা-ই শক্তি, আশ্রয় এবং সর্বজয়ী প্রাণের প্রতীক। গ্রিক দেবকুলের রাজা জিউস তাঁর স্ত্রী হেরার তীক্ষ্ণ সন্দেহদৃষ্টি এবং অমানুষিক হিংস্রতার সামনে মাঝেমধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও দেবতা এবং মানুষের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বজ্র নামের যে অমোঘ এবং দুর্জয় অস্ত্রটি তিনি ব্যবহার করেন, তা কিন্তু অধিকারে, কোনো দেবীর নয়। বৈদিক দেবরাজ ইন্দ্র বা রোমান জুপিটারের (স্বর্গ-পিতা) পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বও নিরঙ্কুশ। তাদের ঐশী মন্ত্রিসভায় নারীসদস্য নেই তা নয়, কিন্তু ক্ষমতার সিঁড়িতে তাদের জায়গা অনেক অবহেলিত অবস্থানে।

আবহমান বাঙালি সমাজের চিত্র এর বিপরীত। পুরুষ নয়, নারীই সেখানে যাবতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধির একচ্ছত্র উৎস। নারী সেখানে কেবল নির্ধারক নয়, সে পূজ্য, কাম্য এবং ঈপ্সিত। নিজেদের আশেক (প্রেমিক) এবং ঈশ্বরকে মাশুক (প্রেমিকা) কল্পনা করে ইরানের সুফিরা প্রকৃতির নির্জনতায় শত শত বছর ধরে

ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেছেন, আর আমরা, প্রায় সারাটা জাতি নিজেদের শ্রীরাধা (জীবাত্মা) কল্পনা করে পরমাত্মার (কৃষ্ণের) জন্য তিন শ বছর ধরে নাটী-হৃদয়ের উদ্বেলিত বেদনায় 'উদ্ভ্রান্ত নৃত্য করেছি। কেবল তাই নয়, এটা সেই জাতি যারা শিবের দেহেও পার্বতীর নারীরূপের লাবণ্য খুঁজে বেড়িয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ভারতীয় আর্যেরা পিতার ভেতরেই শক্তি ও কর্তৃত্বের ঐশ্বরিক প্রতীককে প্রত্যক্ষ করেছেন, মাতার ভেতর নয়।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ'

এই কথা পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় আর্যসমাজের মূল আর্তি। এটা সেই সমাজ যেখানে পিতৃসত্য পালনের জন্য রামকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে নিঃসঙ্গ বনবাসে পাঠানো হয়েছে, পরশুরামকে দিয়ে পিতার আদেশে ঘটানো হয়েছে মাতৃহত্যা, পিতার ভোগলিপ্সার বেদিতে আত্মাহুতি দিয়ে পুরুকে দিয়ে নিজের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়েছে এবং মহাভারতের বিখ্যাত দ্যূতক্রীড়া পর্বে পিতার প্রতিনিধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের মূঢ় সিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত করে রাজ্য, ভ্রাতা ও বধূকে অসম্মানিত নিঃশেষের শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

বাঙালি সমাজের সঙ্গে আর্য, গ্রিক, রোমান, পারসিক বা অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজের মূল পার্থক্য এখানে যে, ওই সমাজগুলো যেখানে মূলত পিতৃতান্ত্রিক, সেখানে আমাদের নদীমাতৃক কৃষিবহুল জীবন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মাতৃতান্ত্রিক। চট্টগ্রামের মারমা-মুরংদের গ্রামে এমন একটা পারিবারিক দৃশ্য কল্পনা করা অবাস্তব নয়, যেখানে নারীরা খাদ্য বা জীবিকার অন্বেষণে বাড়ির বাইরে গিয়ে উদয়াস্ত সংগ্রাম করছে আর পুরুষরা দাওয়ার নিচে সন্তান কোলে নিয়ে বসে তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টায় প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে চলেছে। এই সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক উঁচুতে থাকার কথা, ছিলও তাই। নারী এখানে কর্তা, প্রতিপালক, সমৃদ্ধি ও বরাভয়ের উৎস এবং দৈবের নিয়ামক।

এ জন্যেই কালের অগ্রযাত্রার ভেতর দিয়ে যেসব দৈবী ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা ও পূজায় অভিষিক্ত হয়েছে তারা প্রায় কেউই দেবতা নন, সবাই দেবী। না, আবহমান বাঙালির কোনো দেবতা নেই, ছিল না। দেবতা বলে যে দুয়েকজনের নাম পাওয়া যায় (ধর্মরাজ, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, সত্য নারায়ণ) তারা সংখ্যায় যেমন হাতে গোনা, শক্তির দিক থেকে তেমনি অনুল্লেখ্য। নারীই বাঙালির জীবনের ত্রাতা, উদ্ধার এবং মঙ্গলের প্রতীক। বাংলাদেশের

একালের প্রধান দেবী দুর্গা—নারী। অন্নদায়িনী অন্নদা বা অন্নপূর্ণাও তিনিই। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী কালী নারী। নদী অরণ্য-পরিকীর্ণ মধ্যযুগের মেঘাচ্ছন্ন বাংলাদেশের হিংস্র কুটিল সাপের দেবী মনসাও নারী। শক্তিশালী ব্যাধ বা সবর সম্প্রদায়ের দেবীও নারী। পিতৃতান্ত্রিক আর্যদের সভায় পুরুষ দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মতো এক-আধজন কল্যাণী মূর্তি হয়তো তবু পাওয়া যাবে কিন্তু বাঙালি দেবসম্প্রদায় প্রায় নিরাপোষ রকমে নারীবাদী। পুরুষদের স্থান সেখানে সংকীর্ণ পরিসরে।

পরবর্তীকালে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পথ ধরে, পুরুষ আধিপত্যের মুখে এই সমাজের নারীপ্রাধান্য ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করলেও নারীর এই সংগ্রামী, শক্তিমন্ত ও কল্যাণী রূপ দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বহমান ছিল। মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার অবিচল শপথে উদ্যত মনসামঙ্গল-এর বেহুলা যে অনমনীয় আত্মবিশ্বাসে স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় তুলে অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছিল, চারপাশের মোহকে জয় করে যেভাবে স্বর্গে পৌঁছেছিল, অনিন্দ্যনৃত্যে ইন্দ্রকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল বা যেভাবে শ্বশুরকে মনসার বেদিতে পুজো দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সবকিছুর মধ্যে সেই সংগ্রামী ও কল্যাণী নারীর অপরাজেয় প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া যেভাবে নদের চাঁদকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেদের দল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, সওদাগরের অভিলাষকে ব্যর্থ করে তাকে সদলে ধ্বংস করেছে, সন্ন্যাসীর কবল থেকে স্বামীকে ও নিজেকে বাঁচিয়ে বেদের দলের হিংস্র আক্রমণ এড়িয়ে সুখের জন্য সংগ্রাম করেছে, তার মধ্যেই নারীর এই মঙ্গলময় ও শক্তিমন্ত রূপটি স্পষ্ট হয়ে আছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজে নারীপ্রাধান্যের জায়গায় পুরুষপ্রাধান্য ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এ সমাজের পুরুষ এখনো সাবালক হয়ে ওঠে নি। আমাদের সমাজের পুরুষ এখনো অস্থিমজ্জাহীন এবং অক্ষম; জীবনসংগ্রামে অবিশ্বাসী ও উদ্যোগহীন, শক্তি-কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিচলিত এবং আত্মপ্রত্যয়ে আস্থাহীন। বাঙালি পুরুষের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিনিধি শ্রীকান্ত সুযোগ পেলে প্রেমিকার আশ্রিত হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে সংকোচ অনুভব করে না এবং নিরুপায় অবস্থায় প্রেমিকা তাকে বিদায় করে দিলে এই দার্শনিকতত্ত্বের আড়ালে আত্মসান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে যে, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, তাহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' এমনই আত্মমর্যাদাহীন আর অসহায় আমাদের জাতির অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র।

পুরোপুরি স্বকপোলকল্পনা থেকে কোনো লেখক কিছুই লিখতে পারে না। এতে লেখা অশিল্পে পর্যবসিত হয়। সমাজে যা থাকে লেখকেরা

সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটান। বাঙালি নারীর শক্তি সংগ্রাম এবং মঙ্গলময় রূপ বাঙালির জীবনের সামনে উজ্জ্বল মহিমায় দীর্ঘকাল কিরণ ছড়িয়েছিল বলেই সারা বাংলা সাহিত্য জুড়ে সেই মহিমার ছবি এমন অবিরল। কিন্তু শপথের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ পুরুষ কোথায় বাংলা সাহিত্যে? মঙ্গলার পাশে নদের চাঁদ, রোহিণীর পাশে গোবিন্দলাল, কুসুমের পাসে শশী ডাক্তার কেবল অপদার্থ নয়, হাস্যকর। একেকবার আমার সন্দেহ হয় বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার পুরুষ চরিত্র আদৌ আঁকা হয়েছে কি না কখনো? প্রাগৈতিহাসিক-এর ভিখুর ভেতর আদিমতার শক্তি থাকলেও মনে রাখতে হবে ভিখু পুরুষ নয়, জন্তু। সিরাজদ্দৌলার বজ্রতাসর্বস্ব অসহায়তা ও আস্ফালন অসহনীয়। মহেন্দ্র মুচ, মধুসূদন বর্বর এবং হোসেন মিয়ার বিশাল স্বপ্নসাম্রাজ্য যতটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিধানে তৈরি ততটা বাস্তব সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় শক্তিশালী নয়। আমার ধারণা, এ যাবৎকালের বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার পুরুষ চরিত্র চিত্রিত হয়েছে মোট দুটি। একজন মধ্যযুগের চাঁদ সওদাগর—কালের পরিপ্রেক্ষিতে অতিকায় রকমের আত্মপ্রত্যয়ী ও বলীয়ান—নিজের ধ্বংস বা পতন নিশ্চিত জেনেও সমস্ত ভীতি আর সন্ত্রাসের সামনে অপরাভূত ও অবিচল। দ্বিতীয়জন গোরা, প্রচণ্ড ও বলিষ্ঠ জীবনাগ্রহে জ্বলন্ত। কিন্তু ঘটনা উন্মোচনের ভেতর থেকে এক সময় বেরিয়ে পড়ে দুজনার একজনও বাঙালি নয়—প্রথমজন, চাঁদ সওদাগর, আর্য; দ্বিতীয়জন, গোরা, আইরিশ।

শক্তিতে ও সংগ্রামের দৃপ্ত পুরুষ চরিত্র বাংলা সাহিত্য আজো আমাদের উপহার দিতে পারে নি। আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক পৌরুষদীপ্ত নায়ক আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি—বিদ্যাসাগর, মাইকেল, আশুতোষ, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, নজরুল, ফজলুল হক বা শেখ মুজিবের মতো অনেক পরাক্রান্ত পুরুষ চরিত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এঁরা সবাই বাঙালিত্বের স্বপ্ন, এর বাস্তবতা নয়। এঁরা বাঙালি জীবনের প্রতিভা ও ত্রাতা। বাস্তবের বাঙালির ভেতর আজো কি তেমন কোনো পুরুষ চরিত্রের উত্থান ঘটে নি? না হলে এত অসংখ্য উজ্জ্বল নারীচরিত্রের পাশে কেন এই সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একজন পৌরুষদীপ্ত চরিত্র চিত্রিত হল না।

১৯৯৪

আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত

কবিতা কী, কথাটা বললে অভ্যস্ত বাকপটুতায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তার একটা চটপট উত্তর দিয়ে দেওয়া যায় না, তার কারণ, আর যেখানেই হোক, অন্তত কবিতার বেলায় কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞার একচেটিয়া প্রভুত্ব কেউ কোনো দিন মেনে নেন নি। এই না মেনে নেবার আসল কারণটা বোধহয় এই যে, পৃথিবীতে যে কোনো একটা সংজ্ঞা যতখানি বলতে পারে, কবিতা তার চাইতে বড়। আর বড় বলেই তাকে নানা কথায়, নানা ইশারায় বুঝিয়ে বলতে হয়।

উনিশ শতকের ইংরেজ কবিদের অনেকেই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সবার উক্তির মধ্যেই অল্পবিস্তর সত্যতা আছে কিন্তু কারো যে কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞার মধ্যে কবিতার সবটুকু সত্যকে আমরা একখানে করে পাই না; যতটুকু যা পাই তা তাঁদের সবগুলো সংজ্ঞাকে এক করলে। আসল কথা, তাঁরা সবাই কবিতার জাতি নির্ণয় করতে গিয়ে গোষ্ঠী নির্ণয় করেছিলেন।

যে কোনো শিল্পের বেলাতেই এ অসুবিধা ধরা পড়ে। যদি বলা হয়, কবিতার কবিত্বগুণ জিনিসটি কী? আমি বলব, তার আগে জানা দরকার কবিত্বগুণ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা কী? যদি বলা হয়, কেবল ভাষা, কিংবা কেবল ছন্দ কিংবা কেবল শব্দ কবিতার মূল কথা তবে তার উত্তরে বলব, এর প্রতিটিতে আংশিকভাবে কবিতার পরিচয় থাকলেও পুরোপুরি পরিচয় হয়তো নেই। কেননা, কবিতায় ছন্দ, শব্দ সবই শিল্পের জন্য অপরিহার্য হলেও, শুধুমাত্র ছন্দ কিংবা শুধুমাত্র শব্দচয়নই শিল্প নয়। যা শিল্প তা এদের সবগুলোর সাধারণ গুণ মিলিয়ে তার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে, কিংবা সব মিলিয়ে তা এমন একটা কিছু যাকে নানান ইশারায় ইঙ্গিতে আভাসিত করা যায়, বুঝিয়ে বলা যায় না।

কিন্তু এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব না হলেও শিল্প কী, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা যুগে যুগে চলেছে এবং তার ফলেই আজ আমরা কবিতার আলোচনায় কবিত্বগুণ বলতে কবিতার এমন কিছু লক্ষণকে বুঝে নিতে পেরেছি যা দিয়ে এই আলোচনার কাজটা মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। আধুনিক কবিতার শিল্প বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধেও ওই একই কথা মোটামুটি খাটে।

কবিতার আর্টের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন যুগের লেখকের হাতে বারে বারে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা তো হয়েছে। ফলে কবিতার আর্ট সম্বন্ধে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে নিতে পেরেছি। বলাবাহুল্য এই আর্টের কোনো নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া এ আলোচনায় আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য এই কবিতার কাণ্ডের দিকে নয় বরং এর ওপরের ফুলপাতাবহুল ইশারা আর ইঙ্গিতের দিকে। এই কবিতা পাঠ করতে গিয়ে এর ইঙ্গিতের রূপটি আমার চোখে যেমনভাবে ধরা পড়েছে, সেটাকেই আমি নিজের কথায় বলার চেষ্টা করব।

কথা সরাসরি বা সাদামাঠা করে বললে তা যে সাধারণত কবিতা হয় না, সাহিত্যের মহলে এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত খুব একটা দ্বিমত নেই। সে কারণেই কবিতার মধ্যে ছলাকলার প্রশ্নটি চিরদিনই গ্রহণীয়। কবির কাজ হবে লুকিয়ে ফেলা, আর পাঠক তাকে উদঘাটন করবেন, এই নান্দনিক লুকোচুরির আনন্দই কবিতার আসল কথা।

তবু এই ছলাকলার চরিত্র নিয়ে আধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার একটা পার্থক্য রয়েছে। আমার ধারণা এই পার্থক্য মাত্রার পার্থক্য। এতদিন কবিতা যে সংজ্ঞা মেনে চলেছে তার আসল কথা হল, 'সবটাই বলে দিও না, কিছুটা রেখো।' অর্থাৎ সরাসরিভাবে সবটুকু বলে ফেললে তা আর কবিতা হয় না, তার মধ্যে একটা না বলা থাকা চাই, যেটুকু কোনোদিন বলা হবে না বলেই তা চিরদিন আমাদের কাছে ভালো লাগতে থাকবে। কিন্তু সেখানে সেইসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে তাই বলে এই না-বলাটা যেন এতখানি না হয়ে পড়ে যাতে করে তার আসল অর্থটাই একেবারে লুপ্ত হবার জোগার হয়। আসলে বলাটাই থাকবে সেখানে মূল কথা, না-বলাটা সেই বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সেই বলাটাকে আরও বড় করে বলতে থাকবে।

আধুনিক কবিতায় যে প্রবণতাটা দেখা যাচ্ছে, অনেকদিক থেকেই তাকে এর থেকে আলাদা সারির বলে মনে হয়। এখানে যে কথাটা বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল, সবটুকুই রেখে দিও না, কিছুটা বোলো-ও। যেন ঝোঁকটা না-বলার দিকেই : আর এই না-বলার মধ্যে যেটুকু বলে দেওয়া থাকবে সেটুকুকে অবলম্বন করেই যেন বলাটুকুর দরবারে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা। অন্য কথায়, এর যেটুকু বলা তা যেন অনেকটা কেবল এর ভেতরের ভাবটাকে ধরিয়ে দেবার সুবিধের জন্যে, যাতে করে সে এই বলাটুকুকে বুঝে নিয়ে এর

না-বলাটুকুকে বুঝবার জন্যেও এগিয়ে যেতে পারে। একজন পরিচিত আধুনিক ইংরেজ কবির একটি উক্তির মধ্যে কথাটার প্রমাণ মিলবে। কবি বলছেন : কবিতার অর্থ সবটা লুকিয়ে না ফেলে বরং কিছুটা বাইরে রেখে দেওয়াই ভালো। কেননা, তার মধ্যে পাঠকের মন যখন ধরবে, নিজের কাজে কবিতা তখন সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে। আর কবিতার এই কাজটা যে কী ধরনের সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, চোর রাত্রিবেলায় বাড়ির পোষা কুকুরের সুমুখে মাংস ছুড়ে দিয়ে, যেভাবে নিজের কাজ সেরে চলে যায়, এ-ও অনেকটা তেমনি।

কবিতায় ইঙ্গিতের ওপর জোর সব যুগে সব সাহিত্যে প্রায় একই রকমভাবে দিয়েছে। বলার ভেতর দিয়ে কবিতা যতটা বলেছে না বলে বলেছে তার চাইতে অনেক বেশি। কবিতা সম্বন্ধে তাই এখন অন্তত একটা কথা বলতে পারি যে, কবিতা বলে কম কিন্তু করে বেশি। কথাটা অবশ্যি অনেকখানি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

প্রথমে একটি পুরোনো কবিতার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি।

"শ্যামের নাম রাধা শুনে উতলা হয়েছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কিন্তু যে একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই।" চণ্ডীদাসের "কে বা শুনাইল শ্যাম নাম" কবিতার অনুভূতির তীব্রতার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, আর তার শেষ নেই বলেই নিজেকে প্রকাশ করার জন্যেই সে এমন ব্যাকুল।

এবার আসা যাক—এযুগের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর চিল্কায় সকালের নায়কের মনেও একটা বেগ জন্মেছে, আর তাই সেও এমনি কিছুই বলতে চায়। সে বলে, তোমাকে ভালবেসে আমি আকুল হয়েছি বটে, কিন্তু কী করে বোঝাই তোমাকে আমি কত ভালোবাসি। মুখের ভাষা দিয়ে তো সে আকুলতাকে বোঝানো যাবে না, পৃথিবীর সব কথা একখানে করলেও আমার মনের সে ব্যাকুলতাকে বলা হবে না! তবে কী করে বোঝাই তোমাকে? 'কেমন করে বলি?' 'কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল।' তাই দেখা যাচ্ছে, রাধার মতো তারও মনে একটা আকুলতা আছে, তবে রাধার মতো সে মনের সব কথাকেই বলে দিচ্ছে না, একটু অন্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। রাধা যেখানে মনের সব কথাকে বলে ফেলে নিজেকে ব্যক্ত করেছে, এ কবিতার নায়ক সেখানে নিজেকে ব্যক্ত করছে অনেকখানি না বলে। আর এই না-বলার মধ্য দিয়েই বলাটা চিরদিন আমাদের কানে বাজতে থাকল।

দুটোর মধ্যেই কবিতা আছে, কেননা দুটোই সুন্দর করে বলা। তফাতটা কেবল এই যে একটাতে কবি নিজের সবটাকে ব্যক্ত করেছেন সুন্দর করে বলে,

অন্যটাতে কবি নিজেকে সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন সবটাকে না বলে। আর এখানেই আধুনিক কবিতার সঙ্গে আধুনিক-পূর্ব কবিতার পার্থক্য চিহ্নিত হয়ে যায়, আধুনিক কবিতা এগিয়ে আসে। একটা সংযম, একটা সংক্ষেপ এখানে বড় হয়ে ওঠে যা একটা গভীরতর সঙ্কেত করবার মধ্যেই সমাপ্ত। 'চিল্কায় সকাল' সম্বন্ধে বলতে পারি, এই সংকেতের গুণে এর বক্তব্যই এখানে কবিতা হয়ে উঠেছে। কবিতায় ইঙ্গিতের আসল সার্থকতাই এখানে। অনেক সময় ইঙ্গিতই এখানে কাব্য।

এ প্রসংগে এখানে আর একটি কবিতাকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। কবিতাটি চিল্কায় সকালের তুলনায় আরও একটু একালের। কবিতাটির নাম 'একদিন একটি লোক' :

একদিন একটি লোক এসে বলল, 'পারো?'
বললাম 'কি?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে'। সে বলল আরো,
সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত নিখুঁত ভঙ্গিতে
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'
'কেন?' আমি বললাম শুনে।
সে বলল, 'আমি সেটা পোড়াব আগুনে।'
[ওমর আলী]

ব্যাস! আর বলে দিতে হল না। এই সামান্য কথা কয়টির পেছনে অতীতের একটা পরিপূর্ণ কাহিনী আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। একটা নিরপরাধ প্রেমিক, তার হৃদয়ের পবিত্র প্রেম—একটি সুন্দরী নারীর প্রবঞ্চনা—ধুলায় রক্তে মিশে যাওয়া সেই প্রেমিকের হৃদয়ের অসহায় আর্তনাদ এবং সর্বশেষে তার ক্ষুব্ধ মনের বিকৃত প্রতিহিংসা— সব যেন একসঙ্গে কবিতাটির মধ্যে কথা বলে উঠল। অথচ কী আশ্চর্য সংযম, এতটুকু বাজে খরচ নেই। না কথার, না আবেগের। যেন কবি এতটুকু বলেই পাঠককে বলে দিতে চান, আমি আর বুঝিয়ে বলব না, এবার তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। আর আমাদেরও তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, কেননা কবি এর মধ্যেই আমাদের সবটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটাকেই কবিতার ইঙ্গিত বলতে পারি। এখানে বক্তব্যের মিতব্যয়িতা দেখতে পেলাম, কথার সংযমও পুরোপুরি। ঠিক এ ধরনের একই ভাবের কবিতা যদি দেড় শ বছর আগে কোনো কবির হাতে গিয়ে পড়ত তবে তা যে কিভাবে প্রকাশ পেত, কীটসের 'লা বেলে ডেম স্যানস মার্সি' পাঠ করলে পাঠকের পক্ষে আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হবে না।

বলাকে কমিয়ে এনে ইঙ্গিত দিয়ে তার জায়গা ভরিয়ে তুলবার এই অভিযান আধুনিক কবিতার সব জায়গায় নিজের পায়ের ছাপ রেখে গেছে। উপমাগুলো হয়ে পড়েছে অপাতদৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ, তার অনেকখানি বলা থাকে, অনেকখানিই থাকে না, নিজের অনুভূতির গভীরতায় পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতার ও আধুনিক-পূর্ব কবিতার একটি করে বিখ্যাত উপমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তফাতটা দেখানো যাক। কোনো সদ্যনীরব বিষাদাকুলা রমণীর উপমা দিতে গিয়ে মাইকেল যখন তাকে বর্ণনা করেন 'নীরবিলা শোকাকুলা হায়রে যেমতি/নীরবে ঝংকৃত বীণা' বলে তখন আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, আর যাই হোক, উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে যোগসূত্র এখানে এমন অচ্ছেদ্য যে এর ফলে কেউ কাউকে কোথাও পুরোপুরি ছেড়ে যেতে পারছে না। এখানে যতটুকু বলবার তার সবটাই যেন বলা হয়ে গেছে, আর যেন কোনোকিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কিন্তু এ ধরনের একটা চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এ যুগের জীবনানন্দ দাশ যখন তার প্রেমিকার চোখ দুটোকে 'পাখির নীড়ের' সঙ্গে তুলনা করে বসেন, তখন স্বতই মনে হয়, উপমাটা সুন্দর হল না হয় মানলাম, কিন্তু পাখির নীড়ের সঙ্গে চোখের সম্বন্ধটা কোথায়? এখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা কি আকারগত না প্রকারগত তার কোনো সঠিক উত্তর তো এর মধ্যে দেওয়া নেই। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এখানে কোনো একটি কথাকে গোড়া থেকেই অনুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে যার সবটা কোনোদিন ব্যক্ত হবে না বলেই যা আমাদের কাছে আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা পড়বে এবং উল্লিখিত উপমাটিকে আমাদের চেতনার ওপর আরও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল করে রাখবে। কবি এখানে প্রিয়ার স্নিগ্ধ শান্ত গভীর চোখদুটির সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা দিতে গিয়ে তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন এমন একটি চোখ যা পাখির নীড়ের মতো 'স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ'। এখানে 'পাখির নীড়ের মতো'— এই ধ্বনি কয়টির মিষ্টি ব্যঞ্জনাটুকুর মধ্যেই স্নেহ ও আশ্রয়ে পরিপূর্ণ বনলতা সেনের স্নিগ্ধ চোখদুটো চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, কথাগুলোকে পুরো বুঝিয়ে বলতে হল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আধুনিক কবিতার ব্যয়-সংকোচের প্রবণতাটা এর কাব্যজগতের সব জায়গায় সংক্রমিত। মাঝে মাঝে দু'একটি শব্দকে অনুচ্চ রেখে বক্তব্যকে আরও বেগ দেওয়া এখানে সম্ভব হয়। এবং সেই অনুচ্চ শব্দের শূন্যস্থান ইঙ্গিতের গুণে নিজের নীরবতার মধ্যে আরও বড় হয়ে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই। কবিতাটি সুধীন দত্তের :

ভার নদী তার আবেগের প্রতিনিধি
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার ছবি;
শূন্য আকাশে তারই প্রেম অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম;
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে,
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
আজ সে কেবল আর কারে ভালবাসে।

অংশটুকু পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে এখানে কবিতাটির শেষ পঙক্তির ঠিক আগের পঙক্তিতে একটি 'কিন্তু' অনুচ্চ থেকে গেছে, যা রয়ে গেছে বলেই আগের অংশটুকু পাঠ করে আসবার পর শেষের দুই স্তবকের ভেতরকার গভীর অসহায় যন্ত্রণাটা অমন মর্মান্তিক বৈপরীত্য নিয়ে আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে গেছে। এখানে এই অনুচ্চ শব্দের খালি জায়গাটিকে কবি কোনো শব্দ না বসিয়ে যেন একটা অসহায় আর্তনাদ দিয়েই ভরে দিলেন।

দু'এক জায়গায় এই সংকোচন একটা বিশেষ শব্দের এলাকা ছাড়িয়ে এক একটি অসম্পূর্ণ পঙক্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। কবিতা সেখানে আর হেঁটে এগোয় না, একেবারে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায়। আর তা যায় বলেই বাইরের দিক থেকে তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা অসঙ্গতি বড় হয়ে ধরা পড়ে, যাকে অবিশ্য সামান্য অভিনিবেশের ফলে অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। কবিতার আগাগোড়ার মধ্যে সংযোগ থাকে ঠিকই, তবে মাঝখানের পঙক্তিটি অনুক্ত থাকার ফলে সে তার বক্তব্যের অনেকখানিই বলে ইঙ্গিতে। ফলে বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা তির্যক গভীর সূক্ষ্মতা এসে যায় যার ফলে অনুক্ত স্তবকটির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়। বিষ্ণু দের কবিতাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করেই কথাটাকে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা যাক। হেলেনের প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন :

'হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঙ্কার করতাল
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।'

এবং তার পরের পঙক্তিতে প্রায় সম্পূর্ণ একটা নতুন সুর

'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।'

অংশটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায় যে প্রথম দুই পঙক্তির পর এবং শেষের পঙক্তির আগে একটি পঙক্তি অনুক্ত রাখা হয়েছে যার ফলে প্রথম দুই পঙক্তির সঙ্গে শেষ পঙক্তির অর্থগত এমন একটা আপাত অসংলগ্নতা এসেছে যা কবিতার গতিকে স্বতই একটা বাধার সুমুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই অনুক্ত রাখার কারণ কী? উত্তরে বলা চলবে, পঙক্তিটিকে অনুক্ত রেখে সেই অনুক্ত পঙক্তির অর্থটিকেই একটা ব্যঞ্জনাগত সূক্ষ্মতা দিয়ে পাঠকের মধ্যে আরও গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যেই এমনটা করা। এখানে দ্বিতীয় পঙক্তিটি উত্তীর্ণ হবার পর হঠাৎ তৃতীয় পঙক্তিটিতে এসেই আমরা যে একটা অসংগতির সামনে দাঁড়াই তার মধ্য দিয়েই ট্রয়লাস ও ক্রেসিডার প্রণয়ে হেলেনের প্রেম যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছিল, সেই বাধার অনুভূতিকে আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকি। বলে যা বোঝানো চলত, এখানে না বলেই তার অনেক বেশি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হল।

সঙ্কেতের সাহায্যে নিজেকে ব্যক্ত করবার এই প্রবণতা আধুনিক কবিতার সবগুলো দিককে প্রভাবিত করেছে। ব্যবহারের গুণে এখানে এক একটি শব্দই অনেকখানি বলে, তার বক্তব্য এক এক সময় এক একটা পুরো বাক্যকেও ছাড়িয়ে যায়। দু'একটি শব্দের সংযত টানে আধুনিক কবি ছবির পর ছবি এঁকে চলেন। উদাহরণত :

> "ভরা সকাল।
> ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, ঝিঁ ঝিঁ সন্ধ্যা; ঘুঁটে পোড়ানো"
> — অমিয় চক্রবর্তী

একটা দিনের আগাগোড়া চেহারা যেন চোখের সামনে দেখা গেল। অথচ সে দিনটি কোথাও এতটুকু থেমে নেই, সে ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে ভোরের ভরা ঐশ্বর্য, তারপর ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের উত্তাপ, তারপর সন্ধ্যা, আর সেখানে রঙিন আগুনে চারদিকে ঘুঁটে পোড়ানোর আয়োজন— এ সবেরই যেন একটি আনুপূর্বিক লেখচিত্র পাওয়া গেল। কবি এখানে কয়েকটা কথার ইঙ্গিত দিয়েই একটি সমগ্র ছবিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

দেখা গেছে, বিন্যাসের গুণে পঙক্তি প্যারাগ্রাফগুলো থেকে আরম্ভ করে যতিচিহ্নগুলো পর্যন্ত আর চুপ করে বসে থাকছে না, ভেতরের একটা ঐকান্তিক তাগিদে নিজের অতিরিক্ত একটি নতুন অর্থকে ব্যক্ত করছে। আর কবিতার ভেতরের অর্থটা সেইসঙ্গে একটা আশ্চর্য জোর পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে :

হে সুন্দরী
স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার
চিমড়ানো চিন্তাশীলের নোংরা দুপদরা
অশ্লীল
　　　　　আঙুল তোমাকে
খুঁটে
খুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে
তোমাকে
বিজ্ঞানের বজ্জাত বুড়ো আঙুল তোমাকে
টিপে
টিপে
খুঁজেছে তোমার
　　　　　মাধুরী কত
বার পালে পালে পুরুত তোমাকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে
কুস্তি করে তোমার গর্ভে জন্মাতে চেয়েছে
দেবতা,
　　　　　কিন্তু
তুমি
তোমার ছন্দে বাঁধা
মৃত্যদয়িতের
অপরূপ বাসরে সতী তুমি
তাদের জবাবে শুধু
বসন্তের ফুল
　　　　　ফোটাও

এ কবিতার সবখানি গৌরব কেবল এর কাব্যগুণের মধ্যে নেই, পঙক্তিবিন্যাস থেকে আরম্ভ করে যতিচিহ্নের ব্যবহার, সবকিছু মিলেই এ সম্পূর্ণ। বিশেষ করে পঙক্তিবিন্যাসের ওপর এ কবিতার সাফল্য কতখানি নির্ভরশীল তা এ কবিতার শেষাংশের দিকে সবচেয়ে বেশি করে বোঝা যায়। কবিতার শেষ জায়গায় 'ফোটাও' কথাটার মধ্য দিয়ে কবিতার মূল অনুভূতিটা কোনোমতেই অমন গভীরভাবে, বর্শার ফলার মতো ক্রমশ অমন জমাট, ছুঁচোলো ও তীক্ষ্ণ হয়ে আমাদের মনের ভেতর সরাসরি ঢুকে যেতে পারত না, যদি না পূর্ববর্তী

পঙক্তিগুলোকে ওভাবে সাজিয়ে এনে 'ফোটাও' কথাটাকে কবিতার শেষে অমন অমোঘ কঠিন একাকিত্বের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া না হত।

আধুনিক কবিতার ইঙ্গিতের এই সংক্রমণ ঘটেছে চারদিক থেকে। ভাষা হয়ে পড়ছে সঙ্কেতের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, ভাব পেয়ে যাচ্ছে ব্যঞ্জনা, কবিতা আসছে এগিয়ে এবং সে কবিতার সবটা শরীর সঙ্কেতের এই সূক্ষ্ম অশরীরী উপস্থিতির দ্বারা এমন ভাবে আক্রান্ত যে, কবিতার মূল কাব্যগুণ থেকে তাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে সম্ভাবনার ঐশ্বর্যকে বড়সড় করে তুলে ধরা এ মুহূর্তে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র আলোচনার সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে আধুনিক কবিতার ইঙ্গিতধর্মিতার পুরো পরিচয় দেওয়া সাধের না হলেও সাধ্যের অতীত। আপাতত পরিসরের অনুরোধে অসমাপ্ত কথাগুলোকে সমাপ্তির গোঁজামিল দিয়ে থেমে পড়তে হচ্ছে এবং তা হয়তো এই জাতীয় একটা মনোব্যথা নিয়ে যে —

... this is matter for another rhyme
And I to this may add a second tale.

১৯৮০

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া

১

আমার এক লেখক বন্ধু একবার, ষাটের দশকে, কিশোর উপযোগী একটা সুখপাঠ্য বই লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁকে শিশুসাহিত্যের ব্যাপারে আরো খানিকটা উদ্বুদ্ধ করার জন্য আন্তরিক উৎসাহ থেকে একদিন আমি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সম্পন্নতাগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল বিপরীত। আমার উৎসাহে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। আমার কথা শেষ হলে বিমর্ষ গলায় হতাশা ফুটিয়ে বলেছিলেন, আমাকে তুমি শিশুসাহিত্যিক হতে বলছ!

মাইকেল মধুসূদন দত্তও অদ্ভুতভাবে মনে করতেন যে, গীতিকবিতা লিখে তাঁর পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়, অমর হতে হলে তাঁকে মহাকবি হতে হবে। তাই তিনি মহাকাব্য লেখায় হাত বাড়িয়েছিলেন।

আমাদের চারপাশের প্রায় সব কবির মতো হয়তো আমার সেই কবি বন্ধুটিরও ধারণা ছিল যে স্মরণের জগতে টিকে থাকতে হলে শুধু কবি হয়েই কেবল তা সম্ভব। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক বা শিশুসাহিত্যের অর্থহীন আয়োজনে তার সম্ভাবনা নেহায়েতই ক্ষীণ, এমনকি ভালো লিখলেও। এমনটা যাঁর ভাবনা তাঁর কাছে শিশুসাহিত্যে ভাগ্যান্বেষণের প্রস্তাব এলে গলায় নৈরাশ্যের সুর ফুটে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমার ওই কবি বন্ধু একটু ভালো করে পর্যালোচনা করলেই টের পেতেন যে কাব্যদেবীর বন্দনা কোনো কবির অমরত্বের যেমন নিঃশর্ত গ্যারান্টি নয় তেমনি শিশুসাহিত্যের মতো সাহিত্যের অন্য শাখাগুলোও যে যশোপ্রার্থীদের দীর্ঘায়ুর দরজা থেকে পত্রপাঠ বিদায় করে তাও নয়।

পৃথিবীর এ-যাবৎকালের কোটি কোটি কবিযশপ্রার্থী যেমন বিস্মৃতির নিস্পত্র জগতে হারিয়ে গেছেন তেমনি শিশুসাহিত্যের অসংখ্য শক্তিমান স্রষ্টা মানব স্মরণে অমর জায়গা পেয়েছেন। হ্যান্স ক্রিশ্চান এন্ডারসন বা লুই ক্যারল, অস্কার ওয়াইল্ড বা মার্ক টোয়েন তাঁদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যে অনুপম স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন, সেসবের শিল্পসিদ্ধি পৃথিবীর হাতে গোনা গুটিকয় শ্রেষ্ঠ কবিকে বাদ দিলে ক'জনার চাইতেই বা খাটো?

মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল কাব্যদেবীর আবাহনের পরপরই বন্দনা করছেন কল্পনাদেবীকে :

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাব্য রচনায় হাত দিয়ে তিনি টের পেয়েছিলেন যে বাকদেবীর দুর্লভ আনুকূল্য কবিতার দুঃসাধ্যের যাত্রায় তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে ভরসা যোগালেও যা তাঁর নিয়তির সামনে 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হয়ে দেখা দেবে, তাঁর চিত্ত-ফুলবন-মধু দিয়ে নিরবধিকালের জন্য অত্যাশ্চর্য মৌচাক রচনা করতে পারবে তার নাম কল্পনা। এই কল্পনাই তাঁর সম্পন্ন বক্তব্যকে ছবি আর গানের বর্ণোজ্জ্বল জগতে—ধ্বনিময় চিত্রলোকে—স্মরণীয় জায়গা দেবে।

এই কল্পনা যাকে স্পর্শ করে তার নামই শিল্প—অনুপম, অশ্রুতপূর্ব ও অপার্থিব। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য এমনকি প্রবন্ধ—যা-ই এর হিরণ ত্বকের স্পর্শ পায়, তাই সোনা হয়ে যায়। এখানে ছেঁড়াছাতা আর রাজছত্রের মতো, আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির মতো, কবিতা আর শিশুসাহিত্যের কোনো ভেদ নেই। কল্পনার দীপ্তিতে সম্পন্ন হলে এরা একইরকম চিরন্তন।

যে সম্পন্ন কল্পনা ছড়া বা শিশুরচনাকে শিল্পের টোপর পরায়, কবিতাকেও তা-ই জ্বলিত করে অলীক সৌকর্যে। গড়নে, অবয়বে, শিল্প-স্বভাবে ও ভেতরের তাগিদে ছড়া আর কবিতা তো একই জিনিস। তাই বলে ছড়া বা শিশুরচনা আর কবিতাকে কি হুবহু এক বা সমমাপের জিনিস বলতে পারব? না, তা পারব না। অনেকদূর পর্যন্ত ছড়া বা শিশুকবিতা কবিতার সহযাত্রী হলেও মনে রাখতে হবে ছড়া শেষ অবধি কেবল শিশুরই কবিতা, তার অসম্পূর্ণ উদ্ভট অবিকশিত জীবনের স্বপ্ন ও সত্য। এই জগৎ অনেকটাই খাপছাড়া—স্বপ্নে দেখা পৃথিবীর মতো পারম্পর্যহীন। পরিণত মানুষের জীবনবোধ, গভীরতা, বহুমুখিতা, উত্থান ও অবসানের প্রগাঢ় পদাবলী কী

করে আসবে ছড়ায়? শিল্পের সর্বোচ্চ সিদ্ধিকে, গভীরতম উপলব্ধি বা রক্তক্ষরণকে কী করে স্পর্শ করবে সে? কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরকে স্পর্শ না করলেও একটা উঁচু চূড়া পর্যন্ত ছড়া তো কবিতাই। শিল্প সাফল্যের জন্য কবিতার মতো হুবহু একই শর্ত পূরণ করে ছড়াকেও তো এগোতে হয়।

আগেই বলেছি কবিতার সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য প্রকরণে নয়, প্রসঙ্গে, আধারে নয়, আধেয়তে। ছড়াকার মানুষের সমগ্র জীবনের কবি নন—তাঁর জীবনের শিশু পর্বের কবি। শৈশব-কৈশোরের পর তাঁর এলাকা শেষ হয়ে যায়, কবি এসে দায়িত্ব বুঝে নেন। পরবর্তী পুরো জীবনটার তিনিই রূপকার। জীবনের এই দুটি পর্বের স্বভাব আর মতিগতি আলাদা বলেই কবি আর ছড়াকার আলাদা। নইলে জীবনকে জ্বলিত করার উপকরণ আর উপাচারে এরা দুজনেই এক।

দুজনেরই কারবারের মূল পুঁজি সেই দুই আদি অকৃত্রিম জিনিস : শব্দ আর ছন্দ। কবির মতো ছড়াকারকেও জীবনের কোনো একটা আবেগাশ্রিত বিষয়কে ধ্বনিময় চিত্রলোকের বিস্মিত বাসিন্দা করে তুলতে হয় কল্পনা ঐশ্বর্যের সমান সচ্ছলতা দিয়ে—কবিত্বেরই শক্তি দিয়ে। এখানে কি কেউ কারো চেয়ে কম? 'লুকোচুরি', 'বীরপুরুষ', 'একদিন রাতে আমি', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' রচনাগুলোয় রবীন্দ্রনাথ চিত্রজগৎ, ধ্বনিজগৎ বা ভাবনাজগৎ রচনার কল্পনায় কি কোনখানে কম তাঁর কবিতার অন্য এলাকাগুলোর চেয়ে? নজরুলের 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' কবিতায় শিশুমনের যে করুণ লুব্ধ অসহায়তা আর্ত হয়ে উঠেছে কবিতা প্রতিভার নিরিখে তাকে তাঁর কটা কবিতার চেয়ে হীন বলা যাবে? সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি'তে যে কবিত্বের প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যে কটি কবিতা তার সমান মাপের?

ছড়াকারকে আমি তাই 'কবি' নামে ডাকতে পারলেই খুশি। ছড়াকার সুকুমার রায়কে 'ছড়াকার' না বলে বলতে চাই 'কবি সুকুমার রায়'। মহাকাব্যের কবি, গীতিকাব্যের কবি, প্রকৃতির কবি, প্রেমের কবি, সবাই যদি কবি হতে পারেন, তবে শিশুর কবির 'কবি' হতে আপত্তি কোথায়।

২

আগেই বলেছি শিশুর কবি মানুষের জীবনের শৈশব পর্বের কবি, শিশুর হৃদয়ের ঈপ্সা আর বাস্তবতার কবি। শিশুর স্বপ্ন-লোভ-কামনা ও আকাঙ্ক্ষার জিনিসগুলিকে তাঁর কবিতায় স্বাদে-গন্ধে জীবন্ত করে তুলতে হয় তাঁকে, না হলে শিশুর রসনায় তা ঠিকমতো রোচে না। শিশুর জগৎটি ঠিক কেমন, এবার

তা শিশুর কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর অরণ্যচারী আদিম মানুষদের মতো শিশুরাও এক অবারিত কল্পনা-জগতের অধিবাসী। তার ইচ্ছা-রঙিন 'যা খুশি তাই'-এর পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'র অলীক বাগানে ক্ষিপ্র চটুল কাঠবেড়ালির মতো তার ইতিউতি ছোটাছুটি। এ-কারণেই আমাদের এই ধরাবাঁধা নিয়মের পৃথিবীটা তাকে পদে পদে রক্তাক্ত করে, ক্ষতবিক্ষত করে। বাস্তবের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে পৃথিবীতে সে উদ্ধারহীন আর যন্ত্রণাকাতর একটা জীবন কাটায়। যুক্তির জগৎ তার অপরিণত, কাঁচা মনটার ওপর হত্যাকারীর মতো চেপে বসে থাকে। এর অত্যাচারে সে আর্তনাদ করে। এ-কারণেই নিয়মের জগতের সামান্যতম বিপর্যয় বা পদস্খলন তাকে উৎফুল্ল করে, আশান্বিত করে। নিয়মহীনতার স্বেচ্ছাচার তাই শিশুর শক্তি আর আনন্দের আকৃতি। এ জন্যেই শিশু যখন দেখতে পায় তার চোখের সামনে, হোক সে স্বপ্নে, ভারী ভারী ইট কংক্রিটে গাঁথা দানবীয় বিশাল কলকাতা শহরটা তার শ্বাসরোধকারী শান-বাঁধানো দাপট হারিয়ে হঠাৎ পাগলের মতো দৌড়োতে শুরু করেছে তখন এক অপার্থিব উল্লাসে তার মনটা ভরে যায়। এমনই তো সে দেখতে চায় এই জগৎটাকে—এমনি ছুটি-পাওয়া ভেসে-যাওয়া অবস্থায়। নিয়ম আগলভাঙা স্বেচ্ছাচারী জগৎ শিশুর অবিকশিত কচি মনটার খুব কাছাকাছি। সেই জগতে সে স্বস্তি বোধ করে। পরিণত মানুষের বুদ্ধি বা বিচার বিবেচনা গড়ে ওঠে নি বলে কেবলমাত্র হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া দিয়েই সে জীবনের যাবতীয় দেনা শোধ করতে চায়। তাই নিয়ম-বাস্তবহীন 'যেমন খুশি তেমন'-এর বাড়াবাড়িতে সে তার রুপোর গাছের অলীক হীরে ফলটিকে পেয়ে যায় ভারি অনায়াসেই। এই জন্য সম্ভাব্যতার সবরকম সীমানা পেরিয়ে 'বীরপুরুষ' কবিতায় অসহায় খোকা যখন তেপান্তরের মাঠে একা বিরাট দস্যুদলকে হারিয়ে মায়ের পাশে এসে বীরের মতো দাঁড়ায়, তখন সেই গল্প পড়তে গিয়ে গর্বে আর আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে যায়, তৃপ্তির আনন্দাশ্রুতে চোখ ভিজে ওঠে।

এই যুক্তিহীন অবাস্তবতার জগৎই শিশুর জগৎ। এই জগৎকে যে কবি সুস্বাদু খাবারের মতো স্বাদে গন্ধে মুখরোচক করে তার টেবিলে পরিবেশন করতে পারবেন তিনিই তার কবি। শিশুমনের হয়তো সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটিই—যুক্তির এই সার্বভৌম বিপর্যয়। ওই ব্যাপারটা তার গড়েই ওঠে নি—শিশুর সঙ্গে পরিণত মানুষের মূল তফাতটা এটাই। তার মাথায় অভিজ্ঞতার জগৎ এখনো দানা বাঁধে নি, বুকে জমে ওঠে নি 'আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি'। শিশুর কবিকে হতে হয় শিশুমনের এই যুক্তিহীনতার প্রতিভাবান লিপিকর।

কিন্তু এ-ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে একজন শিশুর। শিশুদের ভেতরে রয়েছে সুস্বাদু খাবারের প্রতি দুরপনেয় লোভ, পরিণত মানুষদের তুলনায় হয়তো বেশিই রয়েছে। তাদের শিশুত্বের মতোই তাদের ওই লোভ স্বাস্থ্যবান আর সজীব। খাবারদাবারের কথামাত্রেই শিশুর রসনা অজান্তে সজল হয়ে যায়; চেহারা করুণ আর অসহায় হয়ে ওঠে। উষ্ণ তপ্ত পরিচর্যায় তার এইসব স্বাদেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ঘটাতে হবে শিশুর কবিকে, না হলে তিনি শিশুর মনের আসল মানুষটি হতে পারবেন না।

শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?
টক টক থাকে নাক হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'টক টক গন্ধ' পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার রসনায় যে সজীবতা দেখা দিয়েছিল শেষ পঙ্‌ক্তিতে আসার পর তা পুরো সক্রিয় হয়ে উঠল। এক আকাশ মাধুর্য চেটে দেখার আস্বাদে তার জিভ ততক্ষণে ভিজে সারা। কাব্যরসের আড়াল দিয়ে খাদ্যরসের বিস্তার তাকে এই কবিতার আরো নিমগ্ন পাঠক করে তুলেছে।

টক, ঝাল, ভাজা-পোড়া বড় প্রিয় শিশুর। 'চিনে বাদাম ভাজে' বা 'চানাচুরগরম' জাতের কথাগুলো কানে আসতেই তার ইন্দ্রিয় জগতে যেন তোলপাড় পড়ে যায়। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে একটা জবরজং মুখরোচক পৃথিবী এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইসব খাদ্যরক্তিম জগতের বর্ণনা তুলে ধরে শিশুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রসনা জগৎকে তরতাজা রাখতে হয় শিশুর কবিকে। তাই 'ছায়াবাজি' কবিতায় সুকুমার রায়কে নানাজাতের ছায়ার কথা বলতে গিয়ে এক ধরনের ছায়ার বর্ণনা দিতে হয়েছে এভাবে : গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

'ভীষণ রোদে ভাজা'—শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। 'ভাজা' শব্দটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর রসনাপরায়ণ চোখ নিজের ঈপ্সিত ভুবন যেন খুঁজে পেল সামনে। শিশুর কবি বলেই শিশুর সামনে তার রসনার জগৎকে এমন জীবন্ত করে তুলতে হল কবিকে। সুকুমার রায় পরিণত মানুষের কবি হলে কবিতার রূপটি হয়তো তিনি খুঁজতে চাইতেন খানিকটা আলাদা উপমায়। খুব বেশি জীবনানন্দীয় হলে হয়তো ভাজার জায়গায় 'ভেজা' শব্দটা ব্যবহার করতেন তিনি। দুপুরের ছায়ার একটা সজল মধুর ছবি ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহী হতেন।

শিশুর ভেতর রয়েছে এক দুর্দান্ত ও আদিম শক্তিমত্তা। তার শারীরিক যোগ্যতা নির্জলা, অফুরন্ত ও নৈসর্গিক। এই শক্তির প্রাচুর্যে তার স্বগোত্রের পরিণত সভ্যদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। জেগে থাকার মুহূর্তগুলোয় সে অদম্য কর্মমুখর, নিদ্রায় সে পরিপূর্ণ ও নিখাদ। কিন্তু যে শক্তিতে সে আর সবার চেয়ে বড় তা হল বিস্মিত হতে পারার শক্তি। পৃথিবীর ঘরে নতুন এসেছে সে। প্রতিটা বস্তুকে সে তাকিয়ে দেখছে প্রথমবারের মতো। দেখে দেখে বিস্ময়ের শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ আজো তার সরল বিশ্বাসের বুকে হঠকারী ছুরি বসায় নি, জাগতিক প্রতারণা গুঁড়িয়ে দেয় নি হাড়। মিথ্যা বা ভুলের সঙ্গে আজো সে অপরিচিত। কোনো কিছুকে যাচিয়ে খতিয়ে সন্দেহ করে দেখার মোহহীন চাউনি আজো তাকে অধিকার করে নি। সাত ভাইয়ের সাতটি চাঁপা ফুল হয়ে গাছের ডালে ফুটে-থাকা পারুল বোনের সঙ্গে কথোপকথন, রাক্ষসের তাড়া খাওয়া নিরাশ্রয় রাজপুত্রকে 'সত্য গাছের দু ভাগ হয়ে নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়া, তারপর ক্রমে তাকে ফলে পরিণত করে রাক্ষসীর অলক্ষ্যে পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়া, দুধের সাগর ক্ষীরের সাগরের মাঝখানে আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা গজমোতির হার মাথায় ক্রীড়ারত হাতি—সবকিছু তার কাছে সত্যি আর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। কোনো কিছুতেই তার অনাস্থা নেই। যাকেই সে বিশ্বাস করে, তাকে দেখেই তার বিস্ময়। 'এমন অদ্ভুত সব জিনিস দিয়েই এই জগৎ তৈরী তা হলে'—আবিষ্কারের খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ভাবে সে। ভেবে অবাক হয়।

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্ভিদকে বলেছেন পশু।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদকে জলজ্যান্ত পশু হয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখছে সে চোখের সামনে। আরে, না হেঁটে কি পারে! আচার্য জগদীশ বসু তাদের পশু বানিয়ে দিয়েছেন না! এমনি সজীব বিস্ময়ের শক্তিতে উজ্জ্বল তাদের জগৎ। বাড়ির কাছের গরমের ছুটির সময়কার নিশ্চুপ তালা লাগানো বিশাল কলেজ ভবনটাকে দেখে সে সহজেই ভেবে বসতে পারে : এই সেই রূপকথার ঘুমন্ত রাজবাড়ি, যেখানে হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া ঘুমায়, সিংহাসনে ঘুমায় রাজা আর রানী, চারপাশে পাত্র-মিত্র সভাসদ সিপাই সান্ত্রী। বাড়ির পেছনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ঝোপঝাড়ের আড়ালে তেপান্তরের উল্কি আঁকা ডাকাতদের ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা মনে হয়। শিশুর জগৎ 'নেই মানা'র জগৎ। আকাশ এর সীমা।

শিশুর কবি শিশুমনের এইসব বিস্ময়ের কবি, নিয়ম-আগল-উধাও করা শিশুদের যুক্তিহীন পৃথিবীর রূপকার। তার এইসব অসম্পূর্ণ,

ভাঙাচোরা, উদ্ভট কামনা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের নিরন্তর যোগানদার। শব্দে, ছন্দে, ছবিতে, গানে, সম্পন্ন কল্পনায় ও বিরল সৌকর্যে শিশুর পৃথিবীকে শিশুর সামনে রংদার করে তাঁকে তুলে ধরতে হয়।

৩

লুৎফর রহমান রিটনের শিশু-কিশোর কবিতার যে দিকগুলো আমাকে তাঁর ব্যাপারে আশান্বিত করে তার একটি হল শিশুর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার ভালো রকমের খবরাখবর তিনি রাখেন। 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'নতুন'কে বিশেষিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, আপাতভাবে সরল নিষ্পাপ মনে হলেও নতুন আসলে নিষ্ঠুর। ['হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন। সহজ প্রবল।'] আগেই বলেছি, শিশুর ভেতরেও রয়েছে এমনি এক সরল অতন্দ্র নিষ্ঠুরতা। 'নতুন' বলেই, জীবনের কঠিন বাস্তবে জেগে ওঠে নি বলেই, এই নিষ্ঠুরতা। রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের শুরুতে শিশু-কিশোর বয়সের এই নিষ্ঠুরতার অনাবিল রূপটি অনন্য :

> 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটি নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুল রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে।
>
> যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

আমি ফটিক আর তার সঙ্গী বালকদের নিষ্ঠুর না বলে জড় বলতে পারলেই বেশি খুশি হব। পৃথিবীর শিশুরা এদের মতোই জড় ও অবোধ। তাদের এই মূঢ়তা সকালবেলার আলোর মতোই অনিন্দ্য। এক জরাহীন, বেদনাহীন, চিরনবীন জগতের বাসিন্দা তারা। বয়স্ক পৃথিবীর দুঃখগুলোও তাদের কাছে খুশির। আমাদের কাছে যা পতনঘটিত মৃত্যু-আশঙ্কা, তার কাছে তাই তেতলার কার্নিশের ওপর দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুদ্দাড় দাবড়ে বেড়ানো। আমাদের কাছে যা কবিতার প্রিয়তম পাণ্ডুলিপির মর্মান্তিক দুর্দশা শিশুর কাছে তা-ই একপ্রস্থ পাতলা কাগজের ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে ছিঁড়ে ফেলার অকারণ উল্লা। শিশুর জগৎ তাই পুলকের জগৎ। অকারণ অনাবিল এক পুলকের পৃথিবী। বাস্তবতা বা পতনের সঙ্গে

এখনো পরিচয় হয় নি বলে শিশুর জগতে বেদনার পদচারণা বেশ খানিকটা সংকুচিত। তার দুঃখের পৃথিবী চেতনা-জগতে সুদূরপ্রসারী হলেও উপস্থিত মূল্যে স্থূল ও ছোট — শারীরিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই তার বসবাস। পরিণত মানুষের আত্মধ্বংসী অভিঘাত তার ভেতর ক্রিয়াশীল নয়। তার দুঃখ তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'। এজন্যে অদ্ভুত রসের পাশাপাশি শিশুর জীবনের অন্যতর প্রধান রস কৌতুকরস। পরিণত মানুষ এখানেই শিশুর থেকে পৃথক। তার জীবনের প্রধান বিষয় বিষাদ। তাই শিশুর মতো তার মূল রস কৌতুক নয়, করুণ। এ জন্যই Our sweetest songs are those that tell of saddest thought — পরিণত মানুষের জীবনের গভীরতর সত্য।

প্রগাঢ় বেদনাকে উপজীব্য করে বলে পরিণত মানুষের কবিতা মহত্ত্বের যে শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারে শিশু-কিশোর কবিতা তা হয়তো পারে না, কিন্তু হাস্য-পরিহাসমুখর আস্বাদ উপভোগের যে রঙিন ও চটুল পৃথিবী শিশু কবিতায় রচিত হতে পারে তা অতুলনীয়। পরিণামজ্ঞানহীনতার কারণে শিশু গাঢ় দুঃখকেও অনাবিল উপভোগের বিষয় করে তুলতে পারে, এমনকি গভীরতম দুঃখকেও।

লুৎফর রহমান রিটন শিশুমনের এই সবকটি প্রবণতারই খবর কমবেশি রাখেন। এই জন্যে জীবনের ছোট ছোট হাজারো বিপর্যয় আর অসঙ্গতিকে তিনি তাঁর ছড়ার মুখরোচক প্লেটে সাজিয়ে শিশুমনের সামনে হাজির করতে পারেন। বড় মানুষদের ফাঁদে-পড়া জীবনটার কৌতুককর দুরবস্থা দেখে অনাবিল হাসিতে গড়িয়ে পড়তে শিশুদের অসুবিধা নেই। কারো কোনো হঠাৎ বিপদ, আছাড় বা মার খাওয়ার দৃশ্য, শিশুরা, তাই অমন নির্জলা উপভোগ করে।

হোটেলে ঢুকেই চ্যাঁচালেন তিনি
আন দেখি বেটা বিরিয়ানি!
হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়—
দ্যান ট্যাহা দ্যান, বিড়ি আনি।
রেগে কন তিনি আন দারুচিনি
সাথে ওয়াটার ঠাণ্ডা।
মাথা চুলকিয়ে বলে বয় ইয়ে...
কই পামু সাব আণ্ডা?
মেজাজটা তার সপ্তমে ওঠে
রেগে কন ব্যাটা বেয়াকুব?
তবু সেই বয় বিচলিত নয়
বলে স্যার, আমি এয়াকুব!

এখানে হোটেলের অবিচলিত বয় এয়াকুবের শ্রবণশক্তির ত্রুটি একটা পরম উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠল শিশু-কিশোরদের কাছে। কিংবা সেই খাই খাই করা আব্দুল হাই, খাই খাই এর সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে যার নাম হাই হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, যে মানুষটি আম জামের সঙ্গে টিভি প্রোগ্রাম খাওয়ার পর হাসি, খুশি, ভুসি এমনকি ঘুসি খেয়েও নির্বিকার এবং এক পর্যায়ে বাড়ি-গাড়ির সঙ্গে পুলিশের ফাঁড়ি খাওয়ার সুবাদে মাঝে মাঝে লাথি খাওয়ার ভাগ্যও পাকা করে নিয়েছে, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দিগ্বিদিকহীন ব্যাগ্রতা শিশু-কিশোরদের বড় বড় চোখগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য অবাক করে রাখে। কিংবা নিজের নাম ভুলে যাওয়া বিমর্ষ ভোলারাম, বাংলা এবং অঙ্কে একই রকম কাঁচা ভোম্বল, রাগী 'বাবার বাবা'র হাতে ছেলেবেলার 'বাবা'র হেনস্তা হওয়ার প্রিয় উপভোগ্য কাল্পনিক দৃশ্য বা নিধিরাম মিত্রের আঁকা সেই ছবিটা যা দেখে কেউ বলছে ও ছবি পেত্নীর, কেউ বলছে হায়েনার, কেউ বলছে গরুর বা ছাগলের 'নয়তোবা হাইজাম্প পাগলের' — কিন্তু শেষে নিধিরাম মিত্র নিজেই এসে ফাঁস করে দেয় যে ছবিটি তার নিজেরই আত্মপ্রতিকৃতি — এ-সবকিছুই শিশু-কিশোরদের নির্জল হাসিতে সংসৃক্ত করে রাখে।

বোঝার ব্যাপারটাই আসলে শিশুদের বিষয় নয়। তাই শিশুসাহিত্যের বোঝার বিষয়টুকু, বলার কথাটুকু —বক্তব্যটুকু —কোনোদিন শিশুদের জন্য রচিত হয় না। শিশুসাহিত্যের এটুকু চিরকালই বড়দের। শিশুসাহিত্যের ভেতর গভীর যা কিছুই থাক সেই জিনিসগুলো কবিকে ধরতে হয় শিশুর ইন্দ্রিয়জগতের ভেতর দিয়ে, ওই জগতের রস, গন্ধ, শব্দ, স্বাদের চমৎকারিত্বের ভেতর দিয়ে। ওই পাওনাটুকু হাতে-নাতে বুঝে পেলেই সে তার নালিশের খাতা থেকে কবিকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজকের সভ্যতার স্বার্থলোলুপ থাবার নিচে মানুষের সরল অবোধ আদিম হৃদয়টা যে কী নির্দয়ভাবে পদদলিত তার ব্যথিত পদবলী এই বইয়ের 'বাঘের বাচ্চা' ছড়াটি পড়ার সময় শিশুরা হয়তো টের পাবে না ঠিকই, কিন্তু চিড়িয়াখানা পালানো গাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ বাঘের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে গুলু মুলু টুলুর উদ্দাম শহর পরিভ্রমণের মুখর মুহূর্তগুলোকে সে প্রাণভরেই উপভোগ করবে। শিশুর জগৎ ওইটুকুই। দরজা-ভাঙা খুশির জগৎ। ওইটুকু পেলেই সে খুশি। সেখানে সে প্রতিদিনকার ছক-কাটা, গৎ-বাঁধা, পাঠ্যবইশাসিত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে একটা সত্যিকার জ্যান্ত বাঘের বাচ্চার সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো সারা শহর ঘুরে বেড়ায়, ওই ভ্রমণের সব ঈর্ষিত গৌরব আর রোমাঞ্চ আস্বাদ করে। শিশুর জীবনকে সুপরিসরভাবে জানেন বলেই রিটন কবিতাটার মধ্যে শিশুর বিস্ময়ের পৃথিবীকে এমন অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন। আর একটা ছোট্ট কবিতা তুলে ধরছি :

নাম তার হরিদাস পাল ছিল
গায়ে তার জোরাকাটা শাল ছিল
পান খেয়ে মুখ তার লাল ছিল
মা-বাবার আদুরে দুলাল ছিল।
তার মামাবাড়ি বরিশাল ছিল
মামিমার তরকারি ঝাল ছিল
সেই ঝাল খাওয়া তার কাল ছিল
বেঁচে নেই আজ, গতকাল ছিল।

এ কবিতার বিষয় পুরোপুরিই বড়দের। মৃত্যুর সঙ্গে শিশু-কিশোর কেবল যে অপরিচিত তাই নয়, এ বিষয়ে প্রায় অবিশ্বাসীই সে। কিন্তু কবিতার ভেতর শাল গায়ে দেওয়া হরিদাস পালের যে পান খাওয়া ঢিলেঢোলা অগোছালো চেহারাটি ভেসে ওঠে সে মানুষটি শিশুমনের কল্পনাকে উৎকর্ণ করে। ওই খাপছাড়া আর উদ্ভটের ছোঁয়া-লাগা লোকটার ভেতর সে তার স্বপ্নের মানুষটাকেই খুঁজে পায় কিছুটা। ওই স্বল্পভাষী অদ্ভুত মানুষটার জন্যেই এটিতে শিশুজীবনের রস ঘন হয়ে জমেছে, কবিতাটির গাঢ় বক্তব্যটুকুর জন্যে নয়। এর শেষ পঙ্‌ক্তি কবিতাটিকে বড়দের কবিতা করেছে, বাকিটুকু শিশুকবিতা।

রিটনের কবিতার সবখানে এমনি বিস্ময় আর হাসির প্রাচুর্য। সেখানে বিস্ময় আর হাসি পরস্পরের উল্টোপিঠ। যে উদ্ভট আর অসঙ্গতিকে দেখে শিশুরা একখানে হাসিতে ভেঙে পড়ছে একটু পরে তাকেই সামান্য অন্যভাবে দেখে তারা একই পরিমাণে অবাক হচ্ছে। শিশুর রসনাকে তৃপ্ত করবার মতো এমনি নানান মুখরোচক মসলাই রয়েছে এখানে, কিন্তু কেবল রসনাকে তৃপ্ত করারই নয়, কানকে প্রীত করার মতো ধ্বনিসৌকর্যের যোগানও রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর ছন্দের জগৎ বৈচিত্র্যময়। এই ছন্দ নিখুঁত, সূক্ষ্ম, স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্ষিপ্র। ছন্দের উচ্ছল ধারাই অনেক সময় কবিতা ফলিয়ে তোলে। মিলের সপারগতা, ক্ষিপ্রতা, দ্যুতি অবাক করে। ছন্দ ও মিলের সপ্রতিভ শক্তিতে তাঁর সাফল্য বাংলা শিশুসাহিত্যের বেশ কিছু উজ্জ্বল সাফল্যের পাশে জায়গা পাবার মতো।

রিটনের কবিতা পড়তে গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল তার মৌলিকতা। তাঁর এই মৌলিকতাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে কোনো অনুভূতিশীল স্মৃতি-প্রভাবিত মানুষের মতো বা সৎ কবির মতো তাঁর এই মৌলিকতাও নিখাদ নয়। একটু খতিয়ে তাকালেই দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু লেখকের প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া ফেলে আছে।

তাঁর অনেক সফল কবিতাও এর বাইরে নয়। এই বইয়ের কবিতার ছন্দশরীরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষান্তি পিসির দিদিশাশুড়ির' কবিতার ছাপ সুস্পষ্ট অবয়বে আঁকা, যেমন 'ম্যাকগাইভারের কাণ্ড' কবিতার গায়ে নজরুলের 'লিচু চুরি'র। তাঁর 'খিদেকে সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' আর রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদার ককটেলই হয়তো বলা যাবে, যেমন 'তোমার আমার', 'ঈদের দিনে' এ-সব কবিতায় জসীমউদদীনের 'আসমানী-বোসমানির'। 'পাত্র সমাচার'-এ সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র'-এর এবং বেশ কিছু কবিতায় সুকান্তের স্পষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়বে। তবু এইসব বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভেতর থেকেও তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, শৈল্পিক দীপ্ততা ও কল্পনাশক্তির অনন্যতা এই কবিতাগুলোর শরীরে এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাকে দীপ্ত করেছে যা এগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় মৌলিক করে তুলেছে। যে কবিতাগুলোয় তিনি মৌলিক সেগুলো সত্যি সত্যি অনবদ্য জিনিস। তাঁর 'বালকের দিনরাত্রি', 'বাঘের বাচ্চা', 'হান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা', 'হোটেলের বয়', 'নাই মামা কানা মামা' কিংবা আরো কিছু চটুল কবিতা যেমন 'ডাক্তার', 'কুস্তি', 'গোবর্ধনের সংবর্ধনায়', 'ভোলারাম', 'ভোম্বল সংবাদ', 'বাবারে বাবা', 'নিধিরাম মিত্র' ইত্যাদি আগামীকালের বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠকের কাছে আদর পাবে।

বুদ্ধির দীপ্তিতে, সজীব রসিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায়, বিস্ময়ের শক্তিতে তাঁর শিশু-কিশোর কবিতা আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা উপহার। আমার অনুভূতি এ-রকম যে সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের শিশুকবিতার ধারার তিনি সবচেয়ে সফল কবি এবং বাংলাভাষার শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন।

১৯৯৫

আবদুশ শাকুরের রম্যরচনা

১

নন্দন-শাস্ত্রবিদেরা অনেককাল আগেই ধরে ফেলেছিলেন যে ট্র্যাজেডি জিনিসটি মহত্ত্বম দুঃখের ব্যাপার হলেও কমেডি নির্ভেজাল আনন্দ নয়। আসলে কমেডির মতো ট্র্যাজেডিরও মূল সুর বেদনা। পার্থক্য মাত্রায়। কমেডি অল্প মাত্রার দুঃখ, ট্রাজেডি বেশি মাত্রার।

কমেডির শরীর যেসব উপাদানে তৈরি কৌতুকের মুখরোচক মসলা প্রজাতিগতভাবে তার একটি। কমেডির সঙ্গে কৌতুকের এই পারিবারিক অভিন্নতার কারণে, কমেডির মতো কৌতুকও এক ধরনের 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'। রাশভারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সবার সামনে আচমকা আছাড় খেলে যে চাপা হাসির রোল ওঠে তার মূলেও আছে এই নিম্নমাত্রার বেদনা। একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদার পতনজনিত বেদনা। একজন শিশু বা বৃদ্ধের এ ধরনের পদস্খলনে এমন হাসির রোল উঠবে না। বরং মর্মান্তিক পরিণতির আতঙ্কে—যা শিশুর জন্যে অতটা না হলেও বৃদ্ধের জন্যে খুবই স্বাভাবিক—হয়তো সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে। এ ধরনের হাসির আর একটি উদাহরণ হিসেবে ভাবা যায় আর একটি ঘটনা। ধরা যাক প্রথম-প্রেমে-পড়া একজুটি প্রেমিক-প্রেমিকা সাদা-মেঘ-ওড়া সুন্দর নীল আকাশের নিচ দিয়ে গল্প করতে করতে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে। ভাবা যেতে পারে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তারা এ ওর দিকে এক আধ পলক তাকিয়ে নিলেও দৃষ্টি তাদের মোটামুটিভাবে ওপরের দিকেই, প্রেমের স্বপ্নবিভোর মুহূর্তে মানব-মানবীর দৃষ্টি যেভাবে, ওপরের দিকে কল্পনার মরালদের সঙ্গে হারিয়ে যেতে চায়, তেমনি। ধরা যাক, এভাবে হাঁটতে হাঁটতে

একবার কথা বলছে প্রেমিকা, একবার প্রেমিক, আবার প্রেমিকা, আবার প্রেমিক—এমনিভাবে সৌন্দর্যের এক বিভোর পৃথিবীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলছে তারা। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে হঠাৎ পাশের প্রেমিকের দিকে চোখ ফেরাল প্রেমিকা। কিন্তু কোথায় প্রেমিক? এ-পাশে ও-পাশে সবদিকে দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নিল ত্রস্তা নায়িকা। কিন্তু কোথাও সে নেই! হঠাৎ আচমকাই খোঁজ মিলল তার। গজ বিশেক পেছনে ফুটপাতের দিকে তাকাতেই স্পষ্ট হল ব্যাপারটা। একটা ম্যানহোলের ভেতর থেকে নায়কের করুণ হাত দুটি প্রত্যাশার আকুতিতে আকাশের দিকে অসহায়ভাবে নড়াচড়া করে চলেছে।

এমনি কৌতুকের মূলেও আছে একটি বেদনা। স্বপ্নের সুউচ্চ শিখর থেকে বাস্তবের ক্লেদাক্ত ম্যানহোলে পতনজনিত বেদনা। তবে ওই বেদনার সঙ্গে ওই হাসির ভেতর মুখ লুকিয়ে রয়েছে আরেকটা জিনিস : অসঙ্গতি। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বা বিভোর প্রেমিকের অপ্রস্তুত পতনের মধ্যে যে বানিকটা দুঃখই কেবল আছে তাই নয়, সেইসঙ্গে আছে একটা অসঙ্গতির অনুভূতি, ওই মুহূর্তে তাদের থেকে যা অপ্রত্যাশিত।

২

বাংলা গদ্যের প্রথম সফল লেখক বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম থেকে শুরু করে আজকের আসহাবউদ্দীন আহমদ বা আবদুশ শাকুর বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখার ভেতর দিয়ে এই সাহিত্যের দুঃখ-অসঙ্গতি-ভরা সম্পন্ন কৌতুকরসের স্রোত অপ্রতিহতভাবে বয়ে চলেছে। দুটি ভিন্ন শাখায় এই কৌতুকের ধারাকে বইতে দেখা যায়। এক, যে লেখকেরা গভীর জীবনবোধকে উদ্‌ঘাটন করার পথে হাস্যকৌতুকের সজীব ছোঁয়ায় রচনাকে স্নিগ্ধ করেছেন। দুই, যারা কেবলমাত্র কৌতুকরসেরই কারবার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বীরযুগের অন্তত দুজন লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে—আমরা প্রথম ধারার প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সাহিত্যে তাঁদের মূল আকৃতি ছিল গভীর জীবনবোধের উৎসার ঘটানো। এটা করেছিলেন তাঁরা হাস্যপরিহাসের সজীব ধারায় সাহিত্যকে নিরন্তরভাবে প্রাণোচ্ছল রেখে। নিজেদের প্রায় সব ধরনের লেখায় তাঁরা মার্জিত প্রসন্ন কৌতুকরসের যে দুর্লভ স্বাক্ষর রেখেছেন, যেভাবে গহন হৃদয়োপলব্ধির সঙ্গে সুস্মিত কৌতুককে অবলীলায় লতিয়ে দিয়েছেন তা বিশ্বসাহিত্যের কিছু কিছু স্মরণীয় সাফল্যের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। সাহিত্যের এই ধারাটি বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ডি এল রায়, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, প্রমথ

চৌধুরী পেরিয়ে নজরুল, বনফুল হয়ে এগিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ধারা রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে আসহাবউদ্দীন আহমদ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। আমাদের সাহিত্যের কৌতুক অঙ্গনের এটা রম্যরচনার ধারা। এই ধারার লেখকেরা প্রধানত কৌতুকরসের কারবারি। জীবনের গভীর রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাইতে এঁরা যে ব্যাপারটির উপর বেশি গুরুত্ব দেন, তাকে এক কথায় বলা যায় কৌতুকাশ্রিত বিনোদন। রম্যরচনার এই ধারাটি, আমার ধারণা আমাদের সাহিত্যের কৌতুকরসেরই একটি অবক্ষয়ী শাখা, উচ্চতর শক্তিমত্তা থেকে আমাদের সাহিত্যের পতন থেকেই সম্ভবত এর উদ্ভব। ঘটনাটি তিরিশোত্তর যুগের। তিরিশের ব্যাপারে আমাদের উচ্ছ্বাস যত অবারিত হোক, মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম বা মাইকেলের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উত্তুঙ্গ জীবনাগ্রহের যে অবিশ্বাস্য জোয়ার জেগেছিল তিরিশের দশকই সেই বৈভবময় যুগের অনটন কবলিত হবার কাল। এই অবক্ষয়ের কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ-বিচ্যুত নিঃস্বতাক্রান্ত বাঙালি জীবনই ছিল এই অবক্ষয়ের মূল উৎসভূমি।

মূল বিষয় ছেড়ে এই আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারে আশংকায় বিষয়টিকে অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

৩

আবদুশ শাকুরকে ওপরের ধারা দুটোর যে কোনো একটায় ঝটপট ফেলে দেব—একটু মন দিয়ে তাঁর রচনাগুলো পড়ার পর এমন অতিসরল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না। ধারা দুটোর কোনোটিরই তিনি পুরোপুরি দখলে নন, আসলে তাঁর অবস্থান একটি তৃতীয় জায়গায়। লেখনভঙ্গির দিক থেকে তিনি অবশ্য পুরোপুরিই রম্যরচনা ধারার লেখক। রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম চক্রবর্তী—এঁদের রচনাশৈলীর ভেতর থেকে উঠে-আসা। তাঁর ভাষার গড়ন বা রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য এঁদের অনেকের লেখাকেই স্মরণ করায়। এঁদের মধ্যে শিবরামের আছরই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। তাঁর রম্যরচনায় মানবিক বিপর্যয়ের পরিচিত ঢঙ বা অনুপ্রাসের কুহকী জগৎ দুটোতেই শিবরামের উপস্থিতি জ্বলজ্বলে। তবু ওই ধারার রম্যরচনাকারদের থেকে একটা জায়গায় তিনি আলাদা। কেবল হাসির জন্য হাসির যোগান দেন না শাকুর। তিনি কৌতুকরস সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রকাশের বাহন

হিসেবে। তাঁর লেখায় রম্যতার সাফল্য বিস্তর, তবু চিন্তার প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য, রম্যতা উপলক্ষ। এইখানে তিনি প্রথম ধারার কাছাকাছি। প্রকরণের দিক থেকে দ্বিতীয় ধারার সগোত্র হলেও প্রসঙ্গের দিক থেকে তাঁর আত্মীয়তা প্রথম ধারার সঙ্গে। না, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের গভীর বেদনাজগৎ তাঁর নেই কিংবা নেই প্রমথ চৌধুরীর অবলীল দীপ্র উপলব্ধিজগৎ, কিন্তু তাঁর ভেতর আছে এঁদেরই কাছাকাছি আর একটি জিনিস—চিন্তা—বৈদগ্ধ্যময়, ধারালো ছুরির মতো শাণিত একটি চকচকে চিন্তাজগৎ। জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়কে দেখার মতো অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণক্ষম একটি প্রখর মনন-সম্পত্তি রয়েছে তাঁর চেতনার ভেতর, যাকে ক্ষিপ্রচটুল হাস্যপরিহাসের ভেতর দিয়ে রম্যরচনায় তিনি তুলে ধরেন সুস্মিত শিল্পীর মতো।

এ জন্য কৌতুকের ভেতর দিয়ে কখনো হয়তো একটি পুরোপুরি ছোটগল্পের আস্বাদ জোটে তাঁর লেখার ভেতর (গুপ্তধন) ; কখনো পাওয়া যায় দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন (আত্মরতি)। কখনো এ আমাদের পৌঁছে দেয় গভীর কোনো বোধের জগতে (আরেক পা)। তাঁর প্রতিটি লেখার সবখানে ঘাই-দেওয়া মাছের মতো ক্রুর অভিঘাতে যা আমাদের নিরন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে যায় তা হল তাঁর এই দ্যুতিময় মননশীলতা। প্রতি পদে এই চিন্তার আঘাত আমাদের আহত করে, জাগ্রত করে, আলোকিত করে এবং একটি নতুন দীপিত জগতে আমাদের উত্তরণ ঘটায়। একটি রম্যরচনার কাছ থেকে এতখানি প্রাপ্তি সত্যিকার অর্থেই দুর্লভ। এ দিক থেকে বাংলা হাস্যকৌতুকের ধারায় তাঁর স্থান তৃতীয় একটি বিন্দুতে। তিনি সেই দলের লেখক যাঁরা রম্যরচনার ছদ্মাবরণে উচ্চতর চেতনাসম্পদ সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। শাকুরকে তাই শুধমাত্র রম্যরচনাকার হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। তিনি রম্যরচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পন্ন ধারার প্রবর্তক। তিনি যা উপহার দিয়েছেন তা সঠিক অর্থে রম্যরচনা নয়, এগুলো রমণীয় রচনা।

শাকুরের রম্যরচনার আর একটা দামি সম্পত্তি এর বৈদগ্ধ্য। এই রম্যরচনাগুলো হাতে নিলেই টের পেতে দেরি হয় না যে এই লেখকের পড়াশোনা বিস্তর এবং ওই জগতে তিনি নিদ্রাহীনভাবে জাগ্রত। ক্ষুরধার ধী-শক্তির কারণে তিনি পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে দৃষ্টিপাত মাত্র নিজের ভেতর আত্মসাৎ করতে পারেন। তাঁর মেধা প্রখর এবং মনন জাগ্রত। তাঁর চিন্তা প্রক্রিয়া আধুনিক। জ্ঞান, মেধা এবং মননের সমবায় তাঁর বৈদগ্ধ্যকে এমন এক পরিশীলিত শ্রী এবং উপভোগ্যতা দিয়েছে যার তুলনা চিরায়ত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই কেবল খুঁজতে হবে। তাঁর প্রতিটি বাক্য পরিশীলন ও মননের উদ্ভাসে আলোকিত এবং আকণ্ঠ উপভোগ্য। তাঁর শব্দেরা সজাগ ও গতিময়। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন মানুষের আটপৌরে জীবনকে উপহার

দিয়েছিলেন কৌতুকরসের চটুল তারল্যে উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী ভাবের আভিজাত্যকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের বর্ণাঢ্য ভাষায়, কৌতুকের মার্জিত রস সংযোজন করে। শাকুরের এলাকা একটু আলাদা। মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও অসহায়তাকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বৈদগ্ধ্যময় ভাষায়। কৌতুকাশ্রিত বাংলা সাহিত্যের ধারায় এটি একটি পৃথক পদপাত।

৪

কৌতুকরস আবদুশ শাকুরের সহজাত। কৌতুকরসের উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে নিম্নমাত্রার দুঃখের কথা বলেছেন সেই অক্ষতিকর মানবিক দুর্দশার ছবি ফুটিয়ে তোলায় তাঁর ক্ষমতা অমিত। নিম্নমাত্রার দুঃখের উদাহরণ দিতে গিয়ে আবদুশ শাকুর তাঁর 'হাস্যরস' প্রবন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তাঁর নিজের হাস্যরসের প্রকৃতি বোঝাবার জন্যেও সে দৃষ্টান্তটি এখানে তুলে ধরছি :

> 'পঞ্চদশ লুইয়ের সভাসদ এক মার্কুইস একদিন সফর থেকে অপ্রত্যাশিত প্রহরে ঘরে ফিরে এলেন। কোথাও কাউকে না পেয়ে বেগম সাহেবার খাস খামরায় ঢুকলেন। সেখানে স্বীয় শত্রীকে তিনি পেলেন বটে, তবে জনৈক বিশপের আলিঙ্গনপাশে 'আবদ্ধাবস্থায়'। মুহূর্তকাল দ্বিধার পর মার্কুইস শান্তপদে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাজপথের দৃশ্যমান জনারণ্যকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করার ঢঙে হাত নাড়তে লাগলেন।
> 'ওকি করছ তুমি?' দুশ্চিন্তাকাতর পত্নীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।
> 'আমার কর্তব্য পালন করছেন বিশপ। তাই তাঁর দায়িত্ব পালন করছি আমি।'

যে যন্ত্রণা ফুলে ফেঁপে দুঃসহ আবেগে বিস্ফোরিত হতে পারত তাকে আলতো হাতে পাচার করে দেওয়ায় যন্ত্রণা কমে গিয়ে মন হাসিতে সপ্রাণ হয়ে উঠল। শাকুর জীবনের ওই পাচার হয়ে যাওয়া টায়ারের দুমড়ে-কুঁকড়ে যাওয়ার অসহায়তাকে সূক্ষ্ম রসিকতার সঙ্গে দেখতে পান ও উপভোগ করতে পারেন। তাঁর 'হায় সপ্তাহান্ত' বা 'গুপ্তধন'-এর স্ত্রীর পেরেকে পাচার হওয়া স্বামী, 'বড়শিতে আদালতের সর্বভুক লোভের বড়শিতে পাচার হওয়া মামলার উমেদার, 'যন্ত্রস্থ যাত্রা'য় যানবাহনের নিগ্রহের তারকাটায় পাচার হওয়া যাত্রী কিংবা 'হরিষে বিষাদ'-এ নিমন্ত্রণের আক্রমণে পাচার হওয়া করুণ গৃহকর্তা কৌতুক জাগায়। সবখানেই এক অক্ষতিকর মানবিক

বিপর্যয় মৃদু বেদনার সহযোগে কৌতুকের জিনিস হয়ে ওঠে। তাঁর রম্যরচনা পরিমাণে খুব একটা বেশি না হলেও এর আপাদমস্তক শরীর নিখাদ ও শাণিত। এবং যেখানে তা সত্যিকার সফল, সেখানে বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার সেরা উদাহরণ বা অবদানগুলোর সঙ্গেই তা তুলনীয়।

যে বিশদ বাস্তবতার বোধ না থাকলে রম্যরচনার ভিত মজবুত হয় না সেই বাস্তবতার ওপর সুপরিসর দখল রয়েছে তাঁর প্রতিভার। প্রখর ধী-শক্তির সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে তিনি দৃষ্টিপাতমাত্রে আত্মসাৎ করতে পারেন বলে চারপাশের বাস্তব জগতের খুঁটিনাটিগুলো তাঁর লেখায় সসম্মানে জায়গা করে নিতে পেরেছে। কবিদের মতো বিমূর্তের লীলাক্ষেত্র তাঁর চারণভূমি নয়। জীবনের বাস্তব সংকটকে পুরোপুরি বাস্তব চোখেই দেখতে জানেন তিনি। এই দেখা সপ্রশ্ন ও অন্তর্ভেদী। তাই মানবিক বিপর্যয়ের কৌতুককর পরিস্থিতিগুলো তাঁর লেখায় এমন পরিপূর্ণ ও নিখাদভাবে উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপনার বাস্তবতায় রসিকতাগুলো হয়ে ওঠে জ্বলজ্বলে আর উপাদেয়।

৫

শোনা যায় পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষা হয়ে এসেছিল কাছাকাছি। ১৯৭৩ সালে একবার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সেদিন কথোপকথনের সময় তাঁর কথা বলার ভাষার সঙ্গে তাঁর লেখার ভাষার তেমন কোনো পার্থক্য আমি পাই নি। হয়তো এমনটাই কমবেশি ঘটে থাকে প্রায় সব লেখক, বিশেষ করে গদ্য লেখকদের বেলায়। তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারের সার্বক্ষণিক ভাষা সামান্য পরিশীলিত রূপে তাঁদের কলমের ভাষা হয়ে যায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, শিবনারায়ণ রায় থেকে শুরু করে সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ সবার ব্যাপারে এমনটাই আমি লক্ষ করেছি।

শাকুরের যেসব গুণের প্রতি আমার সবিশেষ অনুরাগ তাঁর দীপান্বিত ও দ্যুতিময় বাচনভঙ্গি তার একটি। অফুরন্ত উৎসাহে অবারিত ও বিরতিহীনভাবে কথা বলে যাবার এক বিচ্ছুরিত প্রতিভার অধিকারী তিনি। মনে হয় অনায়াসে, মুখে মুখে, কেউ যেন অবলীলায় রচনা করে চলেছে ভাষাশিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। আবদুশ শাকুর আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। অনেকদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর এই অদমিত, মুখরিত ও আত্মবিস্মৃত কথা বলার স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপন দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর এই

ভাষা উজ্জ্বল ও অনিন্দ্য ; বুদ্ধির দীপ্তিতে, ক্ষিপ্র রসিকতায় ও স্বতঃস্ফূর্ততায় সম্পন্ন ও চলিষ্ণু। তাঁর রম্য রচনার ভাষা তাঁর মুখের ভাষারই পরিশ্রুত শৈল্পিক রূপ—তাঁর মুখের কথার আকরিক উপাদানগুলো থেকে মনোরমভাবে ছেঁকে-তোলা অনবদ্য জিনিস। এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। তাঁর মুখের ভাষা তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতির মতোই, অপ্রতিরোধ্য, দুর্দমনীয় ও জন্মান্ধ। অনেক সময় শ্রোতার প্রীতি বা অপ্রীতির ওপর জবরদস্তিরকমভাবে অত্যাচারী ও আত্মবিস্মৃতিপরায়ন। কিন্তু তাঁর রম্যরচনার ভাষা শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। নিটোলতায়, পরিমিতিতে ও সম্পূর্ণতায় কবিতার বিরল সাফল্য আছে এতে। তাঁর মুখের ভাষার আগ্রহ, আকুতি, প্রতিভা ও শক্তিমত্তা থেকে জেগে-ওঠা এ এক পরিশ্রুত পৃথিবী।

তাঁর মুখের ভাষার মতো তাঁর গদ্যও অনিন্দ্য ও উজ্জ্বল। এই গদ্য বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র, কাব্যময়, রঙিন ও ক্ষুরধার। গদ্যশরীর যতখানি নিখাদ আর শাণিত হতে পারে তাঁর ভাষা প্রায় তারই উপমা। আজ আমাদের চারপাশে অযত্ন আর অবহেলায় লেখা শিথিল গদ্য ভাষার যে 'অলীক কুনাট্যরঙ্গ' মাথা উঁচিয়ে উঠেছে শাকুরের রম্যরচনার গদ্য চিরায়ত গদ্যের পক্ষ থেকে তার শক্তিমান প্রতিবাদ। এই ভাষা নিটোল ও নির্মেদ—শৈথিল্য, বাহুল্য বা অতিরিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাওয়া। বিরতিহীন আক্রমণে একটু একটু এগিয়ে বক্তব্যের অবয়বকে পাঠকমনে সম্পূর্ণ করে তোলার পরেই কেবল এই ভাষার মুক্তি। কেবল একটি রচনা (বড়শি) থেকে এখানে গোটা দুই উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

> সেদিন আমি এক পা কবরে-যাওয়া বুড়োদের আরেক পা আবিষ্কার করেছিলাম কোর্টঘরে। আর সেই কোর্টে আমার দুখানি পা-ই যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল। হেঁটে হেঁটে হাঁটু-ভাঙা হয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু দ'-টি হবার যো ছিল না। কেননা সেখানে সকলকে কেবল হাঁটতেই হয়, বসে শুধু কোর্ট। ফলে আদালতে মানুষমাত্রই অণুর মতো অস্থির, নিয়তই নড়নশীল। কোর্টে তাই কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ করাকে ধরা জ্ঞান করা হয়। যেমন—উকিল মক্কেল ধরে, মক্কেল মুহুরী ধরে, মুহুরী পেশকার ধরে। তবে পেশকার আর হাকিম, এ-দুজনেই কেবল করে। একজনে করে মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ, আরেকজনে করে তারই পোশাকী সমর্থন—নির্ধারিত স্থানে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর অঙ্কনের মাধ্যমে।

শাকুরের শব্দের শক্তি বিস্ময়কর। নির্মেদ ও লক্ষ্যভেদী শব্দে তিনি বক্তব্যের ছবি ফুটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন, শব্দের ধ্বনি-জগৎ তৈরি করে ছবিকে রঙিন করে তোলেন।

> যত্রতত্র কিলবিল করছে উকিল আর উকিল। শুধু আমার উকিলটিই মিলছে না। শকুনের মেলে-থাকা ডানার মতো গাউন-উড়ানো উকিলদের চতুর্দিকে ঊর্ধ্বশ্বাস চক্কর-মারা দেখলে মনে হয়—মৃত মক্কেলদের উপর শত শত শকুন পড়ছে।

উপবাসগ্রস্ত উকিলদের কালো জগৎ চোখে ভেসে উঠল।

তাঁর গদ্য ভাষাই যে কেবল শৈথিল্য বাহুল্যহীন তাই নয়, তাঁর রম্যরচনাগুলোর শৈল্পিক সম্পূর্ণতাও অবাক করার মতো। আমাদের সমকালের সবচেয়ে শিল্পসচেতন লেখকদের একজন তিনি। প্রাচীন লঙ্গিনুস দুই হাজার বছর আগেই লক্ষ করেছিলেন যে অতিশয়োক্তি এক ধরনের নয়, দু ধরনের। অতিকথনের মতো স্বল্পকথনও অতিশয়োক্তি। এই দুই ধরনের অতিশয়োক্তি থেকে বাঁচিয়ে সম্যক কথনের ভেতর শিল্পশরীরকে রমণীয় করে তোলাতেই শিল্পের সিদ্ধি। শাকুরের রম্যরচনাগুলো এই ধরনের নিখাদ পারিপাট্যের চমৎকার উদাহরণ। সব রকম স্খলন, অযত্ন, অতিরিক্ততা থেকে বাঁচিয়ে শিল্পের অনিবার্য উপাদানগুলোকে এক নিখুঁত ও পরিমিতি বোধের ভেতর রূপায়িত করেছেন তিনি। একজন সৎ কবির বিশুদ্ধতার আবেগ দিয়ে তিনি তাড়িত হয়েছেন এই রচনাগুলোয়। আশ্চর্য যে এই অভিনন্দনযোগ্য চেষ্টা তিনি করেছেন তাঁর এই রম্যরচনাগুলোয়—সাহিত্যের তুলনামূলকভাবে অপাঙক্তেয় একটি সরণিতে। শিল্পের পরমা নির্মাণে তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। যাঁরা শিল্পের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করেন, এই শৈল্পিক সম্পূর্ণতা তাঁদের চোখে যেমন বিস্ময় জাগাবে, তেমনি শিল্পের স্খলনকে যাঁরা উদার ও ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে ভালবাসেন তারাও এই সম্পূর্ণতার সৌন্দর্যকে প্রশংসা না-করে পারবেন না।

৬

মানুষের মধ্যে কৌতুকরসের জনপ্রিয়তা সব কালেই ব্যাপক। এর সফল স্রষ্টা মানুষের সমাজে প্রিয় ও আদরণীয়। পরশুরাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম থেকে টেনিদা-ঘনাদার স্রষ্টারা সবাই বিপুলভাবে পাঠকনন্দিত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার পেছনেও রয়েছে তাঁদের গদ্যের এই অন্তঃসলিলা হাস্যরস। কিন্তু শাকুরের নিয়তি এর বিপরীত। হাস্যরসের কারবারি হয়েও তাঁর পাঠকপ্রিয়তা তেমন বেশি নয়। এর কারণ তাঁর রচনার সেই দুটি অনন্যসাধারণ সম্পত্তি—মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্য। হৃদয়ের ভাষা চিরকালই সর্বজনীন। প্রাকৃত-নাগরিক, বিদ্বান-ব্রাত্য, হরিপদ কেরানি বা আকবর বাদশাহর সবার মনে তা

একইভাবে হিল্লোলিত। কিন্তু মনন জগৎ রয়েছে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের ভেতর। মানব প্রজাতির বিরলতম সম্পত্তির এটি একটি। এর অধিকারী যেমন সীমিত তেমনি সীমিত এর ভোক্তা। দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্যান্য জ্ঞান জগতের দীপ্র জটিল অন্বেষণের মতো, চিন্তাশীলতার প্রদীপ্ত তীব্র বিভার মতো, মানুষের মননশীলতাও আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘিষ্ঠের আস্বাদের জিনিস। এই জন্য শাকুরের মননাশ্রিত কৌতুক ভিড়ের সম্পত্তি নয়, আর তা হবেও না কোনো দিন, হাসির খোরাক উপহার দিয়েও তাই তাঁকে হয়তো কমবেশি থেকে যেতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সামাজিকের উৎসাহের বাইরে। সাহিত্য জগতের মননির্ভর লেখকদের মতো—বাংলা কবিতার মাইকেল, মোহিতলাল, সুধীন দত্ত, বিষ্ণুদের মতো বা উপন্যাস জগতের রবীন্দ্রনাথ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মননশীল ও বিদগ্ধ স্বল্পসংখ্যক পরিশীলিত সুধী পাঠকের জন্য তিনি হবেন আকণ্ঠ উপভোগ ও আগ্রহের বিষয়। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের মতো। আমরা ভালো করে লক্ষ করলে দেখব গল্পের প্রতি মানবসমাজের অভিনন্দিত উৎসাহ থাকলেও 'ছোটগল্পে'র পাঠকসংখ্যা সে-তুলনায় বেদনাদায়ক-রকমে কম। এর কারণও ছোটগল্পের মননশীল চরিত্র। গল্পের মানবীয় সরসতায় পরিবেশিত হলেও ছোটগল্প আসলে গল্প নয়, প্রবন্ধ—জীবনরসাশ্রিত সহৃদয় প্রবন্ধ। গল্প শোনানো ছোটগল্পের উদ্দেশ্য নয়, এর আসল উদ্দেশ্য সত্যোদ্‌ঘাটন। তাই সত্যটিকে তুলে ধরা মাত্র ছোটগল্পের ভেতরকার গল্পের উদ্দীপনাটিকে মমতাহীনভাবে শেষ করে দেওয়া হয়। ফলে ছোটগল্পের সত্যের অংশটুকু শেষ হলেও গল্প তখনো অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই ছোটগল্পের শেষে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর অতৃপ্তির ভেতর পাঠককে একটা শ্বাসরুদ্ধকর নির্যাতন পোহাতে হয়। জীবনের সত্যকে তুলে ধরার জন্যেই গল্পের ভেতর এত সব জীবনরসের আয়োজন। তাই গল্প যত না আমাদের দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবায়। গল্পের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ অসীম হলেও, ওই চিন্তামূলক পরিণতিটির কারণে 'ছোটগল্পে'র ব্যাপারে তাদের উৎসাহ তাই কম, তাই ছোটগল্পের পাঠক এত সীমিত। গল্প এবং ছোট হওয়া সত্ত্বেও ছোটগল্প অজনপ্রিয়।

আবদুশ শাকুরের মূল দীপ্তি তাঁর মননশীলতা। এই মননশীল প্রকৃতির কারণেই তাঁর রম্যরচনাকেও পড়তে হয় ধীরে, স্বাদ নিয়ে, চেটে, উপভোগ করে করে। তরতরিয়ে এগিয়ে যাবার অবকাশ এখানে নেই। এ ধরনের বৈদগ্ধ্য আর মননের জগতে সে সুযোগ থাকার কথাও নয়। তাঁর বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল প্রকৃতি সত্যিকারের রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। এই বৈদগ্ধ্যের কারণেই তাঁর রম্যরচনাকে হয়তো থেকে যেতে হবে পাঠক জগতের

জনবিরল এলাকায়—মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ ও মেধাবী মানুষের ভালোবাসার পৃথিবীতে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো হয়তো তাঁকেও বলতে হবে : আমার নৈশভোজ জমবে দেরিতে, কিন্তু ভোজের টেবিল হবে আলোকোজ্জ্বল, অতিথি হবে সুনির্ধারিত, হাতে গোনা।

মননশীলতার কারণে তাঁকে কমবেশি পাঠক হারাতে হয়েছে সত্যি, তবু যা তাঁর রম্যরচনাকে আরো পাঠকবিরল করেছে তা তাঁর মননশীলতা নয় বরং তাঁর ওই সম্পদটির বিপজ্জনক রকমের অপব্যবহার।

অতিশয়োক্তি তাঁর রচনাশরীরে নেই, আছে তাঁর মননের আর বৈদগ্ধ্যের আধিক্যে। তাঁর রম্যরচনা এই উপাদানগুলোর বিরতিহীন অতিব্যবহারে যান্ত্রিক। তাঁর তীব্র বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল মনন এমনিতেই সাধারণ পাঠককে হতবুদ্ধি করে। ফলে এসবের আধিক্য হয়ে ওঠে নির্মমতা পর্যায়ের। তাঁর মননশীলতার অনন্য ও অসহনীয় রূপের জগৎ বড় বেশি নির্যাতনকারী। এই উজ্জ্বল দীপ্র বৈদগ্ধ্যের ঠাসবুননির ভেতর সহজ নিশ্বাসের জায়গা কম। গা-এলিয়ে, হাতপা ছড়িয়ে, দৈনন্দিনের সহজ অবকাশের ভেতর একে আস্বাদনের পথ নেই। আমার ধারণা, তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের এই উজ্জ্বল অত্যাচার সাধারণ পাঠককে চিরকাল এর পাঠক হবার পথে বিরত, ব্যাহত করবে।

৭

উজ্জ্বল কৌতুক, বৈদগ্ধ্য, মননশীলতা ও শব্দের প্রতিভাকে সমন্বিত করে আবদুশ শাকুর এমন এক ধরনের রম্যরচনার জন্ম দিয়েছেন যা এগুলোকে রম্যরচনার চেয়ে বড় করে তুলেছে। রম্যরচনার ধারার ভেতর থেকেও এসবের সহযোগে তিনি তাঁর রচনাকে যে পরিশীলন ও শৈল্পিক সম্পূর্ণতা দিয়েছেন তার রসাস্বাদন প্রকৃত রসভোক্তার প্রতীক্ষা করে। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী যে ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন বা কবিতার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র যে ধারার প্রতিনিধি, তিনি সেই ধারারই উত্তরসাধক। বিপুলভাবে পাঠকবিরল এবং সমালোচকদের অনাগ্রহের শিকার হলেও আমার ধারণা, আবদুশ শাকুর বাংলা সাহিত্যের সেইসব সম্পন্ন কৌতুকরস স্রষ্টাদের একজন যাঁরা আমাদের সাহিত্যে, মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্মরণীয় হাস্যরস উপহার দিয়েছেন।

১৯৯৬

আনিসুল হকের কবিতা

কিছুদিন ধরে নানান ছুতোয় আনিসুল হকের লেখা প্রায় সবগুলো বই—তাঁর গোটা সাহিত্যসম্ভারটাই—এক এক করে পড়ে ফেলার সুযোগ ঘটে গেল। প্রথমে পড়তে হয়েছিল তাঁর কবিতার বই তিনটি (খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে, আমি আছি আমার অনলে, আসলে আয়ুর চেয়ে বড় সাধ তার/আকাশ দেখার)। বইগুলো সরাসরি তাঁর হাত থেকেই উপহার পেয়েছিলাম আমি। বইগুলো তাঁর হাত থেকে নেবার সময় প্রতিবারই তাঁর চোখের কোনায় যে ইশারার আলো আমি লক্ষ করেছিলাম তা এরকম : 'কেবল মিষ্টি হেসে বইগুলো হাতিয়ে নিলেই চলবে না, গতর খাটিয়ে একটু পড়তেও হবে।' একজন সপ্রতিভ রম্যসাহিত্য লেখকের ভঙ্গি যেমন হওয়ার কথা অনেকটা তেমনি ভঙ্গিতে। কবিতার বইগুলোর পর হাতে আসে তাঁর রম্যরচনার বই দুটো (গণতান্ত্রিক ফ্যান্টাসী, ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে)। বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানমালায় বাংলাদেশের রম্য রচনার ওপর লিখতে গিয়ে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই পড়তে হয় সেগুলো। এর পর পড়ি তাঁর অনবদ্য ও গভীরতাস্পর্শী উপন্যাস 'ফাঁদ'। এটাও না পড়ে উপায় ছিল না কারণ বইটা স্বয়ং আমার নামে উৎসর্গ করে আমাকে তিনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি আটকে ফেলেছিলেন।

কাজেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমি আজ বাংলাদেশের অন্যতম আনিসুল হক বিশেষজ্ঞ। কথাটা এত করে বলছি এজন্যে যে এটি সত্যি সত্যি আমার জীবনের বিরলতম সাফল্যের একটি। আমি যদি সার্বক্ষণিক লেখক, পাঠক বা গবেষক হতাম তা হলে এই গৌরবগাথা এতখানি সালঙ্কারে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে এত আকুলি বিকুলি করতাম না। কিন্তু আমি একজন গলদঘর্ম সংগঠক। উদয়াস্ত শ্রমের ঘানিটানা মজুর। সংগঠকদের, রাজনীতিবিদদের মতোই, লেখাপড়ার কাজ করতে পারার কথা মাত্র দুটো

পরিস্থিতিতে : জেলে গেলে বা অজ্ঞাতবাসে থাকলে। নেহেরু, গান্ধী, লেনিন আর মাও সেতুঙের মতো বাঘা বাঘা রাজনৈতিক সংগঠকের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। এই অবস্থায় স্থূল সাংগঠনিকতার বৈষয়িক কাজের সার্বক্ষণিক গুঁতোগুঁতির মধ্যে বসেও আমি যে একজন লেখকের ওপর বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছি, তার জন্যে আমার ধন্যবাদ প্রাপ্তির দাবিটুকু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে কুণ্ঠা কোথায়?

তিন ধরনের লেখায় এ পর্যন্ত হাত দিয়েছেন আনিসুল হক এবং আমার ধারণা ওই তিন ধরনের লেখাতেই তিনি শক্তির প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর শক্তি সবচেয়ে বেশি ঝলকে উঠেছে তাঁর রম্যরচনাগুলোয়। এখানে তাঁর কল্পনাশক্তি সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, চঞ্চল ও সপ্রতিভ। হালকা ডানায় উচ্ছল আনন্দে উড়ে বেড়ানোর অবলীলতা রয়েছে তাঁর এখানে। রম্যতা তাঁর রক্তের সবচেয়ে উষ্ণ ও মৌলিক জিনিস। কিন্তু এসত্ত্বেও কবিতা বা উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধিকে তিনি যতটা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছেন, রম্যরচনাকে হয়তো ততটা দেন নি। জানি না শিল্প হিসেবে রম্যরচনাকে তুলনামূলকভাবে নিচুমাপের ধরে নিয়ে শক্তির এই দিকটিকে তিনি কিছুটা উপেক্ষা করেছেন কি না। অথবা হয়তো ঘটেছে অন্যকিছু। হয়তো এর দামি জিনিসগুলোকে অবলীলভাবে নিজের প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়ে গেছেন বলে তাঁর কাছে এগুলোকে মূল্যবান বলে মনে হয় নি। আমার ধারণা রম্যরচনাকে তিনি আরও একটু মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করলে এই এলাকায় তিনি সত্যিকার সাফল্য পাবেন। মানুষ তার সহজাত শক্তির ভেতরেই সবচেয়ে জ্বলজ্বলে।

রম্যরচনার মতো তাঁর উপন্যাসেও একটি নিজস্ব গদ্যভাষা তৈরি করতে পেরেছেন তিনি। কলাম হিসেবে লেখেন বলেই কি না জানি না তাঁর রম্যরচনার শরীরে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব আছে। যেন চঞ্চল পায়ে চটজলদি ছুটে চলছে তাঁর চিন্তা থেকে শব্দপ্রবাহ—সবকিছু। কোথাও ঠিক সুরে দাঁড়াচ্ছে না। তাঁর ফাঁদ উপন্যাসটা এ থেকে অনেকটাই মুক্ত। এর ভাবনাজগৎ গভীর ও নিবিষ্ট, রচনাশরীর সংযত। টের পাওয়া যায় তাঁর অনুভূতিজগৎ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, গাঢ়তর বেদনাসাক্ষাৎ ঘটছে জীবনে, তারই সাথে শিল্পের গায় লাগছে অপরাহ্ণ রৌদ্রের পরিণতির আঁচ। তাঁর এই গভীরতা-যাত্রা আমাকে আশান্বিত করেছে।

আনিসুল হকের কবিতার বই তিনটি। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর কাব্যমুখ আজও তাঁর উপন্যাস বা রম্যরচনার বইয়ের চেয়ে বেশি। কবিতা নিয়ে মত্ততাও তাঁর অনেকদিনের। অন্তত দশ বছরের। কবিতার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্নায় কবিতার অনেক অস্ফুট অচেনা রূপের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর,

অনেক সূক্ষ্ম, অবাক অগোচর পদপাতের খবর জেনে নেবার সুযোগ ঘটেছে। এত সব রোজগার পুরোপুরি বিফলে যাবার কথা নয়। তাঁর ব্যাপারেও তা হয় নি। যখনই তাঁর হৃদয় সত্যিকার আবেগে জেগে ওঠার শক্তি দেখিয়েছে, তক্ষুনি কবিতার ওই ঈপ্সিত প্রকরণগুলো তাতে সাড়া দিয়ে তড়িঘড়ি এগিয়ে এসেছে, তাঁর হাত এমন কিছু উপহার দিয়েছে যাকে কবিতা বলতে আমার বাধা নেই। তাঁর বই তিনটিতে বেশ কিছু কবিতার ভেতর এই সাফল্য যে কোনো পাঠকেরই চোখে পড়বে।

দুটি আবেগ তাঁকে সবচেয়ে বিস্রস্ত করেছে : প্রেম এবং দেশপ্রেম। তাঁর কবিতার মূল আশ্রয় এই আবেগ দুটি, এগুলোর শক্তি থেকেই তাঁর সবচেয়ে জোরালো কবিতাগুলো ফুটে উঠেছে। তাঁর বই তিনটিতে এগুলোর সংখ্যা নেহায়েত কম হবে না। বিশেষ করে প্রেমের কবিতার। এই কবিতাগুলোর ভেতর একটি ব্যর্থ প্রেমের অনুভূতিতে তাঁর অস্তিত্ব প্রায় আগাপাশতলা অধিকৃত। এই যন্ত্রণা আর অসহায়তা তাঁকে বিস্রস্ত করে কেবলই ছেঁড়াখোঁড়া করেছে। এই বিষকে অমৃত করে তোলার আকুতি থেকেই রচিত হয়েছে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো। এ ধরনের তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক আবেগের আলোড়ন এমনিতেই প্রায় কবিতার অনুভূতির কাছাকাছি। যে কোনো কবির পক্ষে একটা সত্যিকার সম্পদ এটি। শব্দ, ছন্দ বা কল্পনাশক্তির সামান্যতম সহযোগে এসব অনুভূতি মুহূর্তে কবিতায় ফলে উঠতে পারে। তাঁর বেলায় ঘটেছেও কিছুটা এরকম। এই নিষ্কৃতিহীন উচ্ছ্বত আবেগ কবিতার দীপ্তি হয়ে ঠিকরে পড়েছে নানান জায়গায়; তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ব্যথা, যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণ ও আর্তনাদ জোরালো আলোয় উজ্জ্বল হয়েছে।

তাঁর এই প্রেমের কবিতাগুলো বেশ খানিকটা আত্মজৈবনিক। অকপট ও আত্মস্বীকৃত তাঁর উচ্চারণ। সাহসী। নিজের দুর্ভাগ্যকে করুণাবহ ভেবে অযথা দীনতায় ভোগেন না তিনি। এই প্রেমের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটাকে প্রায় গল্পের মতো অনুসরণ করা যায়। কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়, তবে তীব্রভাবে অনুভূতি-কাঁপা। বুর্জোয়া সভ্যতার দর্পিত স্থূল শক্তিমত্তার স্টিমরোলারের নিচে সৌন্দর্য, প্রেম ও অনিন্দিত অনুভূতিময়তার পিষ্ট হওয়ার আর্তনাদে তা বিষণ্ণ। মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা তাঁর বেগবান কবিতা 'খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে'র উজ্জীবিত শব্দে এই বেদনা ও এর অনৈতিক সর্বগ্রাসিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের তল কয়েকটি। ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, সামাজিক ভাবনা, নিমগ্ন আত্মোপলব্ধি—এমনি নানা বিভিন্নমুখী জায়গায় তা পথ হেঁটেছে। তাঁর আত্মোপলব্ধিবিধুর কবিতা 'প্রতিনায়কের শেষ সংলাপ' (আমি আছি আমার অনলে) প্রশান্ত আত্মোপলব্ধি ও শৈল্পিক ভারসাম্য দুদিক থেকেই আস্বাদ্য।

তাঁর কবিতার দ্বিতীয় শক্তিশালী আবেগ দেশপ্রেম। আপামর মানুষের জন্য একটি সুখী সম্পন্ন দেশের তিনি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন অকৃত্রিম ও বলীয়ান। সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুল দীনের সারাজীবন'-এর উদ্দীপ্ত আবেগপ্রবাহ থেকে জেগে ওঠা তাঁর আশাবাদী কবিতা 'মানুষ জাগবে ফের' (খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে) সজীব প্রেরণার শক্তিতে উজ্জ্বল। দেশপ্রেমের বেশ কটি ভালো কবিতা রয়েছে তাঁর। তাঁর বিপ্লবী স্বপ্নভাবনাসম্পন্ন কবিতা 'লং মার্চ' দৃশ্যকল্পনার শক্তিতে, রূপকের নিটোলতায় ও সজীবতায় উপভোগ্য। হাতে নাতে এসব দেখিয়ে দেবার জন্যে ওই ছোট্ট কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

জলের কাতারে যুক্ত হয় জল। বেড়ে যায় স্রোতের সাহস।
লাগাতার আসে ওই পানির মিছিল।
মুহূর্তে পতন ঘটে উজবরা। কব্জা করে নেয় ওরা বিমানবন্দর।
ভেসে যায় গুলশান। তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে যায়
সউদী মার্কিন দূতাবাস।

রামপুরা রোড ধরে অমোঘ এগুতে থাকে ক্রুদ্ধ বারিধারা
অধিকৃত হয়ে পড়ে মিথ্যাভাষী বিকৃত টিভিভবন।

কল্লোলশ্লোগানে কাঁপিয়ে সড়ক রাশি রাশি সলিলসৈনিক
অতর্কিতে ঘিরে ফেলে মতিঝিল দিলকুশা ব্যাংক বীমা বাণিজ্যিক অট্টালিকা।

সব ব্যারিকেড ভেঙে জলের যোদ্ধারা করে দখল ক্যান্টনমেন্ট।
অসহায় পড়ে থাকে গোলন্দাজ ট্যাংক।
জলপাই বুহ ভেদ করে বাঁধভাঙা ঢেউ ডুবিয়ে ভাসিয়ে দ্যায়
সেনানায়কের সুরম্য বাসভবন।

অবশেষে ভঙ্গভবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় নির্ভীক উড়তে থাকে পানির পতাকা।
এই ভাবে জল আসে, আরেকবার অন্তত ঢল নামে।
বেনোজল, গোঁয়োজল, অশিক্ষিত কালো জল, খালি পা-খালি গা জল,
চাষা জল, শ্রমজীবী নগ্ন জল, নিরন্ন ক্ষুধিত জল আসে
অনবরত আসতে থাকে সারা বাংলাদেশ থেকে,
নিমজ্জিত হয়ে পড়ে রাজধানী ঢাকা,
অথচ আশ্চর্য এই, মানুষ তখন আর মোটেই দুর্গত নয়।

আগেই বলেছি তাঁর ভালো কবিতাগুলো রচিত হয়েছে এই দুটো আবেগকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা সত্যিকারভাবেই কম। অধিকাংশ কবিতাই আবেগের অনটনে নিষ্প্রভ, অনুভূতি-নিষ্ঠ ; হৃদয় বা কাব্যশক্তি কোনোটিতেই যেন ঠিকমতো আলোড়িত নয়। তাঁর 'আসলে আয়ুর চেয়ে বেশি সাধ তার/আকাশ দেখার' কাব্যগ্রন্থের দশ পঙক্তির সমিল কবিতাগুলো এমনি অনুভূতিগত অনটনের কারণে নীরস ও রক্তহীন। বুদ্ধি এবং চাতুর্যের সম্পন্নতা দিয়ে কবিতাগুলোকে বাঁচানোর যে চেষ্টা করা হয়েছে, সেটাও খুব একটা কাজ দিয়েছে বলে মনে হয় না। বরং হয়েছে উল্টো। কবিতা-শরীরে তা যান্ত্রিকতার সঞ্চার ঘটিয়েছে। কেননা বুদ্ধির যে অসামান্য বিদ্যুতোদ্ভাস একটি সামান্য পঙক্তিকে কবিতার অনন্য পারিজাত করে তুলতে পারে যার উদাহরণ আছে ভারতচন্দ্রে, সে জাতের তীব্র দীপ্র বুদ্ধিমত্তাও এগুলোর ভেতর ক্রিয়াশীল হয় নি। তবে একজন সক্রিয় কবির জন্যে এমন আবেগের অনটন দীর্ঘস্থায়ী হবার কথা নয়। জীবনের নতুন পরিস্থিতি নতুন আবেগের জন্ম ঘটিয়ে কবিতাকে নতুন পথ দেখাবে এমন আশা করতে অসুবিধা নেই। একটি কাব্যভাষা তৈরির দিকে কবির মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এটা তাঁর এখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি। একজন কবির মূল বাস্তুভিটা তো ওটাই। আনিসুল হকের কিছু কবিতায় যথেষ্ট শক্তি ও সজীবতা রয়েছে, কিন্তু সেই নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাষাটি নেই যা দিয়ে তাঁকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে। গলার স্বর থেকে কবিকে চিনতে না পারলে তিনি কবি হবেন কী করে?

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর

জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা

কয়েক বছর আগে আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাগ্রন্থ 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' বের হবার পর আমি বইটির একটি বিস্তৃতকরকমে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম, যদিও, আমি সংশয়াতীতভাবে জানতাম যে ওই কাব্যগ্রন্থটিতে এমন একটি কবিতাও ছিল না যা প্রকৃত বিচারে কবিতার সাফল্যে উত্তীর্ণ। এ সত্ত্বেও বইটি সম্পর্কে যে ওরকম দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তার কারণ : কাব্যগ্রন্থটি পড়ার সময় এক বিস্মিত নতুনের শিহরণ আমাকে এভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিল যে, প্রায় তড়িতাহত, আমার মনে হয়েছিল বইটির মধ্যে সাফল্যের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও এর প্রতিটি শব্দ চিত্র উপমা এক অমিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছে। শব্দ ব্যবহারের বৈদ্যুতিক সাফল্যে এবং রঙিন বর্ণিল অজস্র চিত্র রচনার ব্যাপারে যে অসামান্য প্রতিশ্রুতি তিনি দেখিয়েছিলেন সেই গ্রন্থে তা তাঁর বয়সের একজন অতিতরুণ কবির পক্ষে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর— যা অব্যবহিতভাবে নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার জন্ম দিতে না পারলেও এমন প্রতীতি জাগায় করে যে ওই সম্পন্নতা থেকে একজন সত্যিকার কবির জন্মলাভ ঘটবে। সহজে, অনায়াসে উজ্জ্বল ও অনবদ্য উপমা রচনার অবলীল সেই সজীবতা, শব্দ চয়নের সেই সপ্রাণ সপ্রতিভতা, কাব্য জীবনের শুরুতে শুধুমাত্র 'প্রকৃত' কবিদের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। উপরোক্ত কারণ ছাড়াও অন্য একটি কারণ আমাকে তাঁর কবিতার প্রতি আশান্বিত করে তুলেছিল। সেটা হল তাঁর কবিতার ব্যতিক্রমী 'বিশিষ্টতা'। পূর্বসূরি কবিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতার শরীর অন্যদের থেকে এত আলাদা, তাকাবার চোখ এত নতুন

ও মৌলিক, কণ্ঠস্বর এমন স্বতন্ত্র ও স্বকীয়, উপমা ও চিত্র রচনা এমন একক ও নিজস্ব যে কেবল সমকালের নয়, গত কয়েক দশকের পটভূমিতেও মান্নানের কবিতা অনন্য। কারো কারো কাছে অপ্রিয় ঠেকতে পারে, কিন্তু একথা বলতেই হবে যে আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে মান্নান যে জীবনানুভূতি উপহার দিয়েছেন, সংযোজন করেছেন শব্দের ভাষার এবং রূপকল্পের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার মূল্য যা-ই হোক, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজের। মান্নানের কবিতার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে একটা আলাদা ও অপরিচিত পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হয়।

যে কোনো তরুণ কবির মতো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটিরও প্রধান দোষ ছিল বক্তব্যহীনতা ও অসংযম। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' পড়ে অনুভব করা গিয়েছিল : সম্পন্নতর কবিতা রচনার অনেকগুলো ঈর্ষিত ও দুর্লভ উপকরণ তাঁর করায়ত্ত। তাঁর উদ্‌গ্রীব কল্পনাশক্তি যেকোনো সজীব অঙ্কুরকেই সফল লালনের জন্যে পুরোপুরি উন্মুখ ও উপযোগী। শুধুমাত্র উচ্চতর বক্তব্যের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হলেই তা শ্রেয় কবিতার ফলোৎপাদনে সপারগ হয়ে উঠবে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা সম্বন্ধে সেই উদ্‌গ্রীব আশাবাদ বহুলাংশে সফল হয়েছে। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র তুলনায় 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' পরিণত চৈতন্যের ফসল। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র চেয়ে এর শব্দেরা অনেক উজ্জ্বল ও তীব্র, উপমারা নিটোল ও বলিষ্ঠ, চিত্রকল্প সপ্রতিভ ও রক্তিম এবং প্রায় প্রতিটি কবিতা কিছু না কিছু বক্তব্যের দ্বারা সংক্রমিত। অভিনিবেশের সঙ্গে পড়লে সহজেই বোঝা যায় : প্রথম গ্রন্থের অপরিণতি, অসংযম ও দুর্বলতা কাটিয়ে তাঁর কবিতা সমর্থপায়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। অনুভূতির অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা ও কুয়াশা সরে গিয়ে আত্মার ঘনিষ্ঠ স্বর নতুন দ্বীপের মতো জেগে উঠেছে।

তা ছাড়া এ বইয়ের আর একটি উল্লেখ্য দিক আছে। এই বইয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবনবোধ তাঁর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। একেক সময় মনে হয় জীবনকে যেন অনেকখানি দেখে ফেলেছেন তিনি, জেনে ফেলেছেন মানবভাগ্যের বহু অর্থহীন পূর্বাপর, জীবনের স্বাভাবিক ক্ষয় ও বিফলতাকে সহজে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার মতো নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত মানসিক অবস্থা ও নির্মোহ পৌঢ়ত্ব আয়ত্ত করেছেন। তাঁর এই মানসিক পরিণতি এই গ্রন্থের কাব্য-শরীরকে আক্রান্ত করেছে। মাঝে মাঝে তাঁর হৃদয়ের মতো কবিতার স্বরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, আনত হৃদয় গাঢ় বেদনায় কথা বলেছে প্রশান্ত বিকেলের মতো :

সবুজ চাঁদের নীচে পড়ে আছে আমার শরীর।
চেতনা, তারার নীচে। আমার চিৎকার উঠে যায়
অলীক ফিটনে চড়ে ঘুরে ঘুরে আরক্ত রাস্তায়
নীল শূন্যে। নদী : আমার জীবন; বাকী সব : তীর।

[মরণের অভিজ্ঞান]

আগেই বলেছি প্রথম গ্রন্থের মতো এই কাব্যেরও প্রধান সম্পত্তি অজস্র অনিন্দ্য উপমা, অগণ্য রঙিন ও বিস্ময়কর চিত্রকল্প, শব্দের আবার ও বিপুল সচ্ছলতা। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র মতোই এই কাব্যের কবিতাগুলো পড়ার সময় একটা আর্টগ্যালারির কথা মনে আসে, যার তাকে তাকে সাজানো রয়েছে বিচিত্র রকমের ছবি, যার দেয়ালে, চারপাশে, উঁচুতে, নিচুতে অজস্র ছবির সমাহার। প্রতিটি বাক্য যেন একটি উপমা; প্রতিটি শব্দকে মনে হয় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। নিচে দু'চারটি চিত্র তুলে দিচ্ছি। পাঠকেরা এগুলো থেকে এ গ্রন্থের উপমাসাফল্যের খানিকটা পরিচয় পাবেন :

ক. জাফরান-রোদ সন্ধ্যার চিকুরে আঁচড়ায় সোনার চিরুণী
খ. হাবসী মেঘের দল চাঁদের রানীকে ঘিরে আসে
গ. যখন তারার আলপিনে আঁটা রাত
ঘ. জ্যোতি ফ্যালে লম্বা গাছগুলি—
দুমড়ানো শিক যেনো সরু, প্রাকৃতিক বারাণ্ডায়;
ঙ. রাত্রি আকাশের গাঢ় ফেজ টুপি-পরা কালো খোজা
আর সোনালী ফরশা সুলতানা
শুয়ে আছে মেঘে আর চাঁদে আকাশের সুনীল পালঙে
চ. আংটির মতো ঠোঁট গোল-করা এতটুকু মেয়ে
ছ. ন্যাংটো ফরশা মেয়ে মানুষের মতো আগুন জ্বলছে দূরে
জ. সূর্যাস্ত ফেলেছে নিঃশব্দে ফেরেশতাদের রঙ-চঙে কাপড়-চোপড়

'উপমাই কবিত্ব'— জীবনানন্দ দাশের এই ঢালাও উক্তিটিকে যদি কবিতা বিচারের শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া যেত, তবে মান্নানকে শুধুমাত্র 'সৎ কবি' বললে তাঁর প্রতি অবিচার হত, তাঁকে তখন আখ্যায়িত করার দরকার হত একজন 'রীতিমতো সম্পন্ন' কবি বলে। তাঁর উপমা ও রূপকল্প নির্মাণের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা যে কোনো কবির পক্ষেই দুর্লভ আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। চিত্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো সমসাময়িক কবির চেয়ে তিনি সম্ভবত বেশি শক্তিমান। তা ছাড়া তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যও বিস্ময়কর। শুধুমাত্র মৌলিকতার জন্য নাম যদি কবিতা হত— একজন কবির কাব্যমূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হত

তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার পরিমাণের দ্বারা, তা হলেও মান্নানকে একজন উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিতে হত। মান্নানের কবিতা যে কী অনিবার্যভাবে বিশিষ্ট, তাঁর কাব্যস্বাতন্ত্র্য যে কী ঈর্ষাজনকরকমে একক, তা তাঁর যে কোনো একটি কবিতা হাতে নিলেই অনুভব করা যায়। বলতে বাধা নেই যে আমাদের সমকালের বাংলা ভাষার অনেক উল্লেখযোগ্য কবির চেয়েও তিনি মৌলিক। তরুণ কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সম্ভবত সবচেয়ে 'বিশিষ্ট'। তবু আবদুল মান্নান সৈয়দের শব্দ, উপমা রূপকল্পের উজ্জ্বলতা ও সাফল্য তাঁর কবিতাকে যতখানি 'সম্পন্ন' বলে দাবি করে তাঁর কবিতার প্রকৃত মান সে পর্যায়ের নয় বলেই আমার ধারণা। প্রশ্ন উঠতে পারে, এসবের পর তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ ভাবার পথে বাধা কোথায়? এ কথার উত্তর দেবার আগে, আমার বিশ্বাস, কবিতার একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

কবিতা কী? কবিতা কি শুধু ছন্দ? শুধু শব্দ? শুধু উপমা? শুধু মৌলিকতা? শুধু মহত্তর বিষয়, শুধুমাত্র হৃদয়োৎসার বা মনন?— না। এরা প্রত্যেকেই কবিতার অবধারিত উপাদান— কাব্যের সহজাত ও মৌলিক উপচারাবলি। এদের সবার মধ্যেই আংশিকভাবে কবিতার সম্ভাবনা থাকলেও এরা কেউ এককভাবে কবিতা নয়। কবিতা এদের অবাক অনিন্দ্য যোগফলের নাম। কবিতা এদের অলীক সমবায়ে রচিত এক বিস্ময়সুস্মিত রজনীগন্ধা।

কবিতার যে উপাদানগুলোর কথা ওপরে উল্লেখ করলাম, মান্নানের কবিতায় তার অধিকাংশ লক্ষণই বর্তমান। শুধু বর্তমান নয়, কখনো কখনো সচ্ছলভাবে উপস্থিত। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহে তাঁর তীব্র ও বৈদ্যুতিক ক্ষমতা, তাঁর ধারালো ও উদ্যত মনন, চিত্রকল্প রচনার জাদুকরী সপারগতা, বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনেক সময় প্রায় বড় কবিদের কাছাকাছি। যে কোনো কবির পক্ষে এতগুলো দুর্মূল্য সম্পদের অধিকার, নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কবিতাকে সফল ও পরিপূর্ণ ভাবতে যে সর্বত্র দ্বিধা অনুভব করি তার কারণ : তাঁর কবিতা বিচিত্র ও অনিন্দ্য উপকরণের আশ্চর্য সমবায়ে হয়ে ওঠে নি সেই নিটোল অনুপম গোলাপ, নিজেকে মেলে ধরতে পারে নি জীবিত ছন্দে, রঙিন উপমায়, আনন্দিত শব্দাবলিতে। তাঁর প্রতিভার একটি দিক যে পরিমাণে উজ্জ্বল ও সপারগ অন্য অংশ ঠিক একই পরিমাণে নিরক্ত ও মৃত। এই কারণে কবিতার জৈবিক পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা সম্ভব হয় নি এর পক্ষে। তাঁর কবিতায় বহিরঙ্গের প্রসাধনসৌকর্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি দুঃখময় ও অনটনগ্রস্ত এর অন্তরঙ্গের জীবনানুভূতি। তাঁর কবিতা পড়ার সময় একেকবার মনে হয় : বাইরের অনবদ্য আভরণ-সৌন্দর্যের অন্তরালে এ কবিতা বুঝিবা এক রুগ্ণ বিকল বার্ধক্যের নিষ্প্রাণ চারণক্ষেত্র। যে অসময়োচিত মানসিক পরিণতি তাঁর কবিতায় স্থানবিশেষে ভূয়িষ্ঠ জীবনচেতনার সম্পদ

উপহার দিয়েছে সেই অকাল পরিণতির সপ্রতিভ পাপই তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে শুষ্ক, নিরস, হৃদয়বর্জিত ও প্রাণহীন। তাঁর কবিতায় 'মনন' যে পরিমাণে তীব্র ও উজ্জ্বল, 'হৃদয়' সে পরিমাণে জাগ্রত নয়। ফলে তাঁর কবিতাকে অনেক সময় বুদ্ধি ও মননের এক চমকপ্রদ সংকলনক্ষেত্র বলে মনে হয়। জীবন্ত হৃদয়ের স্পর্শ তাঁর কবিতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উজ্জীবিত ও প্রাণময় করে তোলে না— শব্দেরা হয়ে ওঠে না দীপ্ত ও কোলাহলময়। উদ্বেল হৃদয়প্রাচুর্যের ভাঁড়ারে অনটন থাকায় তা আমাদের জীবিত হৃদয়ের ভেতর প্রবেশপথ না পেয়ে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়।

তা ছাড়া, তাঁর কবিতার পরতে পরতে সাবলীল সংগীতময়তার অভাবও বেদনাদায়ক। তাঁর কবিতা সচ্ছল স্বাভাবিকতায়, নদীর মতো বা বাতাসের মতো বয়ে যায় না। গতিহীন, মন্থর ও আড়ষ্ট এর অবয়ব। ছন্দের অসমতল ও বিদঘুটে রাস্তার বিব্রত উঁচু-নিচুতে পথ হাঁটতে হোঁচট খেতে হয়। মাঝেমধ্যে ছন্দের ত্রুটিও লক্ষণীয়। দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

> সোনার বন্যার মতো গলগল করে বলি অমিতাভ আকাঙ্ক্ষার কথা
> যেন উড়ে চলে যায় বালকের হাত থেকে হাওয়া-ভরা শত রঙিন
> ফানুস;

অথবা

> রাত দিন টুঁড়ে মরছি সবুজ স্বর।
> আজ খুশী দেখি : এই-তো ঈশ্বর॥

প্রথম উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় পঙক্তিতে দুই মাত্রা বেশি হওয়ায় ছন্দস্খলন ঘটেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটির দ্বিতীয় পঙক্তিতে এক মাত্রার অভাব লক্ষণীয়। মান্নানের মতো একজন সচেতন কবির পক্ষে এসব ত্রুটি অসংগত।]

আবদুল মান্নান সৈয়দ সেইসব কবিদের একজন যাঁদের কবিতার ঔজ্জ্বল্য ও দ্যুতি সীমিতসংখ্যক কাব্যামোদীর বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের কারণ হলেও বৃহত্তর পাঠকসমাজকে স্পর্শ করতে পারেনা। এর জন্যে দায়ী প্রধানত তাঁদের বিশিষ্ট ও নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, শব্দ উপমা ও রূপকল্পের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বকীয় প্রকৃতি, জীবনাস্বাদনের সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যক্তিগত চরিত্র— এক কথায় তাঁদের একান্ত, বিশিষ্ট ও উৎকট মৌলিকতা— যা তাঁদের সীমিত, খণ্ডিত ও একান্তভাবে নিজস্ব জীবনবোধের ফসল। তাঁদের এই বিস্ময়কর 'মৌলিকতা' এবং 'স্বাতন্ত্র্যের' নিরাপোষ একক ও স্ব-স্বভাবী প্রকৃতি তাঁদের জীবন-কৌতূহলকে জীবনের বহু বিচিত্র পিপাসা ও প্রয়াসের বিপুল অবগাহন থেকে সরিয়ে এনে সীমিত ব্যক্তিত্বের স্বকীয় ও নিজস্ব পথে এগিয়ে দেয়। ফলে তাঁদের জীবনবোধ হয়ে দাঁড়ায়

বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও একক— আপোষহীনরকমে মৌলিক অর্থাৎ খণ্ডিত। তাঁদের পরিপার্শ্বের দেশ ও কাল-ধৃত ব্যাপক জনসংঘের বিচিত্র ও বহুমুখী চিন্তা ও অনুভবের সহজ প্রতিনিধিত্ব থাকে না তাঁদের মধ্যে। এ কারণেই তাঁদের অব্যবহিত জনগোষ্ঠী তাঁদের রচনার পৃষ্ঠায় নিজেদের জীবন-প্রয়াসের অব্যর্থ ও সমার্থক প্রতিরূপ খুঁজে পায় না। ফলে তাঁদের রচনা স্বল্পসংখ্যক প্রবুদ্ধ চিত্তের আংশিক শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করলেও বৃহত্তর জনসংঘের জীবন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দের মৌলিকতা তাঁর জীবনবোধের ক্ষেত্রে দুঃখজনক গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। তাঁর জীবনানুভূতি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর ক্রন্দন ও পিপাসা তাঁর একলার, তার বিশ্বাস ও ব্যর্থতা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, তাঁর পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর 'চাল-ডাল-নুন, অন্ন-বস্ত্র-গৃহ, শস্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষা, চাকরি-ব্যবসা' অধ্যুষিত 'ভুবনডাঙার' মানুষের বিপুল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার মিল সামান্য। 'দরজা-জানালা-বন্ধ করা' একটা অদ্ভুত পৃথিবীর মানুষ তিনি। যখন সবাই চলে যায় 'গলায় জড়িয়ে গলা গল্প করতে করতে মানবীর খোপে', বাইরে যখন জীবনের তুমুল উজ্জ্বল সুসমাচার মুখরিত, তখন এই নির্জন বিচ্ছিন্ন স্ব-স্বভাবী কবি আত্মগত নিঃসঙ্গতার অন্ধকার প্রদোষছায়ায় জীবনের জীর্ণ স্বস্তয়নে নিয়োজিত :

> শুধু আমি গৃহকোণে, গোধূলির নীলাঞ্জনে অক্ষর বসিয়ে চলি সারে-সারে
> বিধিলিপি, মুদ্রাদোষে, দায়িত্বের ভার, কিংবা শুধু ঝোঁকে,'

এক আলো-জানালাহীন কুঠুরির অদ্ভুত নির্বাসন তাঁর বিধিলিপি যা তাঁকে প্রতিমুহূর্তে চারপাশের ব্যাপক জনসমাজের বোধ-চৈতন্য-অনুভূতি-পিপাসা থেকে আলাদা করে এক ভিন্ন ও একগুঁয়ে স্বাতন্ত্র্যের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে নিশ্চিত উপলব্ধি :

> 'কবিতা, আমার মুশকিল, কেন যে হল না লোকায়ত।'

অথবা

> 'আমার কি দোষ, বলো, যদি বেঁকে-বেঁকে যায় যতোবার অক্ষর
> লিখেছি?'

যখন 'বিশ্ব-বাংলার ঘরে-ঘরে' আলোর উৎসব রচিত তখন নিজের 'দীপহীন অন্ধকার ঘরে' 'নিজের আগুনে জ্বালা' লণ্ঠনকে উন্মুখ ও সক্রিয় রাখবার একান্ত ও নিবিষ্ট চেষ্টায় তিনি ব্রতী। বাইরের বিপুল ও বিচিত্র জীবনপ্রবাহের

অজস্রমুখ কল্লোল তাঁর কাছে স্থূল, অকর্ষিত, বোধশক্তিহীন একদল মাংসাশী বর্বরের নির্বোধ অর্থশূন্য 'কোরাস' শুধু। মানবতার বিপুল মহান সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের প্রতি আস্থাহীন, অবিশ্বাসী তিনি। তাই ভয় :

> 'সুতরাং— সুতরাং কোরাসের সদস্যই হবো?'

এর চেয়ে ঢের ভালো সেই একাকিত্ব— সেই দুঃসহ, দুর্বহ তবু প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত একাকিত্ব।

> 'বরং একলা করো— এ প্রার্থনা ঃ'

যে বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বাইরের অবার জীবনপ্রবাহকে আলিঙ্গনের কামনায় চারপাশের অবধারিত কারাগারের নির্দয় ও পাষাণপ্রাচীর ভেঙে পৃথিবীর পথে বেরোবার আ কাঙ্ক্ষায় উন্মুখ সেই সময় মান্নান ফিরে যেতে চান অন্ধকার, মলিন ও ঘিনঘিনে তাঁর সেই একাকিত্বের চক্ষুহীন ঘরের শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণতায়, যেখানে

'বই হচ্ছে আজকালকার দরোজা-জানালা, আমি ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ওর ভিতর দিয়ে বাতাস বওয়াতে চাই, আকাশ থেকে নীলিমা ছেকে আনতে চাই।'

মানবতার বিপুল ও বহুমুখী বিকাশকে নিজের ভেতর শোষণ করতে পারেন নি মান্নান। তাই তাঁর জীবনবোধ এত সীমিত ও অপরিসর। জীবনকে তিনি দেখেছেন দেয়াল-ঘেরা সংকীর্ণ কুঠুরির আলো-বাতাসহীন অপর্যাপ্ততার জগৎ থেকে— বাইরের বিশাল ও বহতা জীবনের সাবলীল পদপাত সেখানে অনাহূত অতিথির মতো সংকোচ এবং কুণ্ঠায় অপরাধীর মতো প্রবেশ করে। মান্নানের সমস্যা এবং বিশ্বাস একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত পৃথিবীর সমস্যা ও বিশ্বাস। অন্যদের জীবন-প্রয়োজন থেকে তা এমন উৎকট রকমে আলাদা, কুঠুরিগত, স্ব-স্বভাবী ও বিশিষ্ট যে সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতার কোনো বাস্তব প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাবে এমন আশা করা কঠিন। ব্যাপকতর জীবনবোধের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয় না বলেই তাঁর কবিতার বক্তব্য এত অপর্যাপ্ত। সুস্পষ্ট ও সদর্থক বক্তব্যের অভাবে তাঁর কবিতাকে যে প্রায়শই লক্ষ্যহীন উপমা-রূপকের সংকলন হয়ে উঠতে দেখা যায়, তার কারণ এই-ই। আমার বিশ্বাস : প্রতিভা ও প্রসাধনসৌকর্যের যত উজ্জ্বল ও অনন্য উপচারেই সজ্জিত হোক এ কবিতা, যত অনবদ্য উপকরণরাজিতেই অনিন্দ্য হয়ে উঠুক, যতক্ষণ পর্যন্ত ফলবান জীবনচেতনার দ্বারা আক্রান্ত না হচ্ছে এ শিল্প, ততক্ষণ অর্থপূর্ণ সফলতাকে স্পর্শ করা এ কবিতার পক্ষে অসম্ভব হবে।

'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'র প্রথম পর্ব— 'শব্দের জ্যামিতি' এবং মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা বিধৃত করলাম। এই কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব— 'উড়ন্ত অনুভূতি' অস্পষ্টতায় এবং তরল ও অপরিণত উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যে 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র সমগোত্রীয়। এই পর্বে কবিতার উজ্জ্বল ও শাণিত সফলতা মাঝে মাঝে মুখ ঝিকিয়ে উঠলেও বক্তব্যের অস্বচ্ছতা, জটিলতা, কুয়াশা ও উদ্দেশ্যহীন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাহুল্যে ও অসংযমে কবিতার উর্বর সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে।

এই অংশের দ্বিতীয় কবিতানাট্য 'বিশ্বাসের তরু'তে একটি মহৎ কাব্য পরিকল্পনা লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে ঐশ্বর্যবান খণ্ডও রয়েছে। এই কাব্যনাট্যের শেষ পর্যায়ে উন্মত্ত কাঠুরেদের কুঠারের অবিশ্রান্ত উদ্যত আঘাতে উচ্চকিত ও সন্ত্রস্ত বনভূমির আর্তনাদ ও বিশাল পতনের শব্দ জীবন্ত হয়ে উঠেছে শব্দ ব্যবহারের ধ্বনিময় সাফল্যে। কাঠুরেদের দুর্জয় ক্রোধ ও ধ্বংসোন্মাদনা ও বনভূমির ভীত, উৎকণ্ঠিত আর্তি ও হাহাকার আমাদের অস্তিত্বকে দীর্ঘকালের জন্যে সেই সর্বধ্বংসী তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ ও শিহরিত ঘটনাস্থল করে রাখে :

> হিতাং কুঠার বাজে, ধ্বংসে করো বিশ্বাসের তরু,
> আজ সে সর্বতোশূন্য যাকে পুরো চেয়েছি ভিতরে,
> হিতাং কুঠার নাচে, ধ্বংসে করো বিশ্বাসের তরু,
> বজ্রবুকে উদ্ভিন্ন শ্রাবণের মেঘের মাদলে,
> হিতাং কুঠার জ্বলে, ধ্বংসে করো বিশ্বাসের তরু,
> হিতাং কুঠার বাজে, শক্ত কাঠে হৃদয় উপড়ে
> ধ্বংসে করো বিশ্বাসের তরু, ভাঙো বিশ্বাসের তরু,
> শূন্য বুকে তাঁথ সুরমার জল ফুঁসে ওঠে জোরে,
> ভাঙো, ভেঙে ফ্যালো, মানবিক আদিম শিকড় থেকে
> বর্তমান ডালপালা ছিন্নভিন্ন করো ভেঙেচুরে
> হিতাং কুঠার চৈতন্যের, বাজো, ধ্বংসে করো তরু,
> উড়াই পিতার ভুল, ধর্ম নির্দেশের পাতা ছিঁড়ে
> ফ্যালো তাঁথ সুরমায়, ধ্বংসে করো বিশ্বাসের তরু—

আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে এই মাপের সাফল্য বিরল। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতার মতো এই কাব্যনাট্যেরও বক্তব্য অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, কুয়াশাময়। এতে পরিপূর্ণ কবিতার ফলন বিঘ্নিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। শেষ কবিতানাট্য 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'র বক্তব্য অংশ নতুনত্বের নিশ্চিত আলো জ্বালাতে পারে নি সত্যি, কিন্তু এর কবিত্বময় ভাষা বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয়

লেখকদের সঙ্গেই শুধু তুলনীয়।

'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' গত এক দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর অন্যতম। অন্যতম দুটি কারণে। এক, এই কাব্যের সাফল্যের অংশ সমকালীন প্রায় যে কোনো কাব্যের চেয়ে বেশি। দুই, এই কাব্যের ব্যর্থতার পরিমাণও অধিকাংশ সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থের তুলনায় অধিক। আবদুল মান্নান সৈয়দের শক্তি এবং দুর্বলতা দুটোই তাঁর সমকালীন প্রায় সব কবির চেয়ে বেশি। ফলে অনেক উজ্জ্বল, সপরাগ অনিন্দ্য কাব্যাংশের স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও ভারসাম্যময়, নিটোল ও পরিপূর্ণ কবিতার জনক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর চেয়ে অনেক কম শক্তিমান কবিও আমাদের কাব্যক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে সার্থকতর কবিতা উপহার দিয়েছেন। এসবের পরেও তাঁর কবিতা যে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহলকে উন্মুখ রাখে তার কারণ : অনেক ত্রুটি, অক্ষমতা ও বিফলতা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় সাফল্যের উচ্চতম শাখাকে ছোঁবার যে স্পর্ধিত আকাশচুম্বী উদ্যোগ দেখা যায়, আমাদের চারপাশের আলোহীন ভবিষ্যৎহীন মাঝারির ভেদাভেদহীন দঙ্গলে তা নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভবিষ্যতে মান্নানের কবিতা কোন পথে এগোবে, কোন ঋদ্ধ সাফল্যের শীর্ষকে তা ছুঁতে সক্ষম হবে, অথবা অদৃশ্য হবে কোন নামহীন প্রয়োজনহীন উৎরাইয়ে— এই মুহূর্তে তা বলা দুরূহ। তাঁর এযাবৎকালের কবিতা সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় : সমৃদ্ধ সার্থকতায় না পৌঁছোলেও তাঁর কবিতায় মৌলিক কবিতার লক্ষণসমূহ বর্তমান।

১৯৭০

রফিক আজাদ-এর
অসম্ভবের পায়ে

১

কোনো কাল যখন নতুন পালাবদলের চৌহদ্দিতে এসে দাঁড়ায়, নতুন ঋতুর সাথে অসংখ্য নতুন অপরিচিত চেতনা, অপরিচিত দেশের অচেনা রাজপুত্রদের মত, সমাজ জীবনের অঙ্গনে দেখা দিতে শুরু করে, তখন, সেইসব অস্ফুট অলক্ষ্য অনুভূতিকে প্রথমবারের মতো জীবিত শব্দে গেঁথে নেবার ভার পড়ে প্রধানত কবির ওপর। মোটামুটিভাবে কবি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজ মানসের অঙ্গনে নতুন চেতনার এই রক্তিম সংক্রামকে প্রথমবারের মতো অনুভব করেন উৎকর্ণ রক্তে, সেইসব জীবানুভূতিগুলোর ব্যাপারে সজাগ হন , যারা নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর প্রায় অজান্তে, আমাদের সমাজশরীরে দেখা দিতে শুরু করেছে। অনেকটা এ কারণেই, সমাজমানসের মৃদুতম আলোড়ন বা অস্ফুটতম পরিবর্তন অন্য কোথাও ধরা পড়ার আগে কবিতাদেহে অমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে সামাজিক ঋতুবদলের রোমাঞ্চকর খবর পরিবেশনাই কবিতার সবচেয়ে বড় কিংবা শেষ কথা নয়,— এটা কবিতার একটা অনিবার্য শর্ত। একজন কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর কালের বিশ্বস্ত ছবিই আঁকতে পারেন— সচেতনভাবে বা নিজের অজান্তে। কবি যদি হন সাধারণ ও বিত্তহীন তবে স্বভাবতই তিনি হয়ে দাঁড়াবেন আপাতরম্যের উপাসক—ফলে যুগের বাইরের চেহারাটাই সুস্পষ্ট হবে তাঁর কবিতায়। কিন্তু যদি গভীরতর জীবনানুভব ছুঁয়ে থাকে তাঁর আঙুল, বোধি হয় বেদনাময়, তবে তাঁর কালের পিপাসা যন্ত্রণা ও পরিপূর্ণতাকেই তিনি আঁকবেন মহত্তর অভিধায়— স্বকালকে তিনি সর্বকালের প্রতিনিধি করে তুলতে পারবেন।

২

ষাটের দশক আমাদের সামাজিক অঙ্গনে এসেছিল স্বাধীনতা ও অভিশাপ নিয়ে। একদিকে বিত্তের বিপুল সম্ভাবনায় স্পন্দিত হয়েছিল সমাজ জীবনের চৌহদ্দি, অন্যদিকে অবারিত সুলভ সুরার দর্পিত আবেশে নতুন সচ্ছলতার সঙ্গে নতুন ও অপ্রতিহত পাপ বয়ে এনেছিল আমাদের জাতির জীবনে। সুকুমার মূল্যবোধের ওপর হাত রেখেছিল হত্যাকারী অবক্ষয়। ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, বর্বরের দম্ভে, আপাতরকমের ফেনিল বন্যায়, ক্লেদে ও কদর্যতায় ষাটের দশক একদিকে যেমন আবিল, ঠিক তেমনি, ওই সময়কার অধঃপতনের ক্রন্দনে, আত্মক্লেদের গ্লানিতে, নৈরাশ্যে ও নিষ্ঠুরতায় তা বেদনাময়। ষাটের দশকের কবিতা, এই কারণেই, সম্ভাবনা ও পরাজিত বিবেকের স্বপ্নে ও বিকারে, ক্রন্দনে ও কামনায় অমন স্ববিরোধী।

সমাজ জীবনের এমনি এক পালাবদলের কালে রফিক আজাদ কবিতা লিখতে শুরু করেন। শুধুমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেন বললে সবটা বলা হবে না। তিনি ছিলেন ওই নতুন সময়ের সবচেয়ে ও অনিবার্য সন্তান। ষাটের দশক বলতে যে ক্লেদ এবং কদর্যতার ছবি আমাদের চোখে ভাসে, ষাটের রফিক প্রায় তারই প্রতীক। যে পচন এবং বিকার, রোগ এবং বৈকল্য ষাটের দশককে নিঃশেষিত করেছিল, যে কালো অবক্ষয় আমাদের সামাজিক অঙ্গনের বুকের ওপর কঠিন ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রফিক তারই প্রতিভূ। তাঁর এই পর্বের কবিতাগ্রন্থ 'অসম্ভবের পায়ে' সেই প্রতিকারহীন অধঃপতনের কান্নায়, আত্মক্লেদের গ্লানিতে আগাগোড়া আবিল ও অশ্রুময়—অবধারিত পচন থেকে অম্লান উদ্ধারের দিকে—দুর্লভ অথচ ঈপ্সিত, অপ্রাপনীয় তবু প্রার্থিত অসম্ভবের পায়ের প্রতি নতজানু :

> 'পদাঘাতে মোহ্যমান নই—
> পদাশ্রিত : হে মাধবী, তোমাতেই পুঁতে রাখি আমু।'

রফিক আজাদের মধ্যে একটা 'স্পর্শকাতর যৌবনকে' দেখেছিলাম আমরা, একদিন। তাঁর যুগের পাপ এবং যন্ত্রণা তাঁকে, তাঁর সতীর্থদের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি বিস্রস্ত ও বিষণ্ন করেছিল— ওই যন্ত্রণা ও ক্লেদের রক্তিম ও ব্যথিত বর্ণনা, এ জন্যেই, তাঁর কবিতায়, অতখানি উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'অসম্ভবের পায়ের' ভেতর এমন একজন যন্ত্রণাকাতর যুবককে দেখতে পাই, জীবনের স্বাস্থ্যময়তা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে— আর যে, দুঃস্বপ্ন-আক্রান্ত, অম্লান উদ্ধারের "দ্বারে এসে পড়ে আছে

কনকনে শীতের রাত্রিতে" আর তার সামনে 'ঠা ঠা হাসে অন্ধকার। আর প্রবেশ-নিষেধ বলে জ্বলে এক রক্ত-চক্ষু বাল্ব।' [হে দরোজা]

চার পাশে অগভীর অস্বচ্ছ অমিল জলরাশি।
রক্তপুঁজ মাখামাখি আমাদের ভাল বাসাবাসি
এখন পাবো না আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই।
[নগর ধ্বংসের আগে]

তাঁকে ঘিরে যা দাঁড়িয়ে আছে তা এক পতিত লাম্পট্যগ্রস্ত সময়—যে অজন্মা দুরূহ কালে কোমল স্বপ্নেরা উধাও—আর সে ওষ্ঠহীন উদ্ধারহীন আবিলতার ভিতর :

এ গ্রহের কেউ হায় প্রকৃত আনন্দকে জানলো না
শুভ্রতা ও মৃত্যুকে জানলো না
বিষাদ ও মৃত্যুকে জানলো না
মুক্তি ও মৃত্যুকে জানলো না
অন্বেষণকে না, হৃদয়কে না, মেধাকে না
ভালোবাসাকে না।

তাঁর যুগের মত, তাঁর অম্লান হৃদয়ও হয়েছিল ওই পাপের দুরপনেয় শিকার, তাই অপচিত অন্ধকার থেকে আলোময় মুক্তির কামনা তাঁর কবিতায় অমন তীব্র।

ষাটের দশকের ক্লেদাক্ত ছবি এঁকেছিলেন রফিক আজাদ—সে প্রতিশোধপরায়ণ ক্লেদ তাঁর কবিতাকেও আক্রমণ করেছিল। একটা আবিল উদ্ভট গুমট আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে তাঁর কবিতাকে।— রূপকল্পগুলোও প্রায়শ যৌনতাক্রান্ত : (১) অথচ অন্যেরা জানে :/ লাম্পট্যে সে মুঘল সম্রাট; নির্বিবেক বদমাশ,/ ঘৃণ্য গণিকালয়ের সন্ত !— যদিও জানে না কেউ/ নবুয়ত-প্রাপ্তিকালে পয়গম্বরের মত সে শিউরে ওঠে/ অন্তরঙ্গ গণিকাবৃন্দের নষ্ট উরুর আঘ্রাণে [কবি]। (২) আলোকিত রাস্তাগুলো তাদের পাতলা পেটিকোট খুলে আমায় আহ্বান করছে, অলৌকিক [শরীরী পুতুল]। (৩) কিংবা নিরুপায় ছুটে যাই বারের নৈঃসঙ্গ্য থেকে/ সিফিলিসাক্রান্ত কোনো গণিকার ঘরে, মধ্যরাতে [জন্মদিনের জর্নাল]। (৪) ফিরে যাই/ ব্যর্থ মনোরথ। হে দরোজা, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতায়,/ উন্মাদের অহংকারে তবু তোমাকে আযোনি-আত্মা/ অনুভবে ধরি [হে দরোজা]।

ষাটের দশকে তাঁর কবিতা রুগ্ণতা ও অশ্লীলতার অভিযোগে যে অমন সার্বিকভাবে নিন্দিত হয়েছিল, তার কারণও এ-ই। আর এইটে আরো বেশি করে হয়েছিল ওই সময়কার রক্তাক্ত মুখাবয়বের যথার্থ ছবি তিনি ফোটাতে পেরেছিলেন বলেই। কিন্তু একজন সহৃদয় পাঠক, যিনি বাইরের এইসব

বর্ণিল, উজ্জ্বল আপাতরম্যের আবরণ তুলে ভেতরের প্রকৃত দৃশ্য দেখতে পারেন, তিনি এই আপাত আবিলতার পেছনে আলোকপ্রত্যাশী একটি আত্মার কণ্ঠস্বরই শুনতে পারবেন :

"হে নরো, হে নারি,/ দ্যাখো, একটা মানুষের চোখে ঘুম নেই, রাত্রি কেড়ে নিয়েছে নিদ্রা তার— আর/ তোমরা কি গভীর মজা লুটছো! একটি মানুষ তার কণ্ঠমণি সাঁড়াশির/ মতো হাতে চেপে ধরেছে, বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, ... ট্রাক চাপা-পড়া কুকুরের মত খেঁতলে যাচ্ছে; অথচ তোমরা, হে নরো, হে নারি, স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় তাকে উপেক্ষা করছো; মোজেস, মোহাম্মদের মতোই অমল ছিলো তার আত্মা।"

মৃত্যু আর যৌনতা তাঁর কাছে জীবনের এপিঠ ওপিঠ, প্রেম এবং মৃত্যু-চেতনা সমার্থক। যে ঘাতক সময় ভালোবাসার উজ্জ্বলিত কামনাকে ক্রূর মৃত্যুর নামান্তর নয় তো কি? ওই নিশ্চিত অর্থহীনতাবোধের সংক্রমেই তাঁর কবিতায় যৌনতা অমন নৈরাশ্য-আক্রান্ত এবং জীবন মৃত্যুধৃত।

হে মহিলা অম্লান গোলাপ, বিবর্ণ বিকলে তুমি
মৃত্যুকেই জেনেছো কি সর্বশেষ প্রিয়জন বলে?
স্থির জেনো, প্রসাধিত হে আমার প্রচ্ছন্ন প্রতিমা—
কোমল ও মোলায়েম স্থানগুলি তোমার তনুর
শক্ত ও নীরক্ত হবে, ক্রমান্বয়ে, কোনো একদিন।
একদা তোমার ঐ অকৃত্রিম ওষ্ঠাধরনিমা
অতর্কিতে তার আক্রমণে আজকের মত সাদা
হয়ে যাবে— প্রতিপ্রভ নিতম্ব তোমার, স্বচ্ছতম
উরুসন্ধি, হে মধুর মহিলা, কদর্য পুরুষকেও
আকর্ষণে, হায়, ক্ষমতা হারাবে যেনো সেইদিন।
[জন্মদিনের জর্নাল]

তাঁর কবিতার এই মৃত্যু আক্রান্ত রূপটি অনুভব করতে না পারলে এ কথা বোঝা সম্ভব হবে না কেন তাঁর কবিতার বিষয়গত অধঃপতনও এতখানি মহত্ত্বময়—যার ফলে তা শক্তিমান কবিতার উপযোগী উপকরণ।

৩

'অসম্ভবের পায়ে'র নতুন বিষয়ের মতো এর ভাষাও ছিল সে সময়ের পক্ষে নতুন। কেবল নতুন নয়, দুঃসাহসী। সে সময়কার গতানুগতিক শব্দের ভিড়

তাঁর শব্দেরা নতুন টাকার উজ্জ্বলতায় ও ঝনৎকারে চমক জাগিয়েছিল। আর এটা হয়েছিল তাঁর কবিতা নতুন সময়ের জীবনানুভূতিতে সঠিকভাবে অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে। অনেক উষ্ণ অনাস্বাদিত পুলক, অনেক উত্তপ্ত রক্তিম জীবনচেতনা তাঁর কবিতায় শিল্পায়িত হয়েছে অনিবার্য সজীব শব্দে। ভাষার উদাহরণের জন্যে দ্বিতীয় দফা উদ্ধৃতি আহরণ নিষ্প্রয়োজন। সচেতন পাঠক এ যাবৎ উদ্ধৃত বাক্যগুলো থেকে তাঁর শব্দপ্রতিভার নমুনা পেয়েছেন।

প্রসংগত একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সে সময়কার কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে রফিকের নতুনত্ব যেসব জিনিসের কাছে ঋণী সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর ওপর বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ারের কবিতার প্রভাব। শুধু রফিক আজাদ নয়, সামগ্রিকভাবে ষাটের কবিতা, কি এখানকার কি পশ্চিমবঙ্গের, এই বুদ্ধদেবীয় বোদলেয়ারের কাছে ঋণী। বোদলেয়ারীয় নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণাবোধ, দুঃখ, পাপ-চেতনা ও বিষাদগ্রস্ততা— এ সব ষাটের প্রায় সব কবির মতো, রফিক আজাদকেও আক্রান্ত করেছিল। তবে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যে তাঁর ওপর এ প্রভাব ছিল প্রায় সর্বাত্মক— প্রায় আপাদমস্তক আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি এই মানসতার দ্বারা, যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ষাট দশকের বোদলেয়ারী মানসিকতার অনিবার্য বাংলাদেশীয় প্রতিনিধি। ১৯৭০ সালের দিকে তরুণ সমালোচক মাহবুবুল আলম 'কণ্ঠস্বরে' 'অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস' এর ('অসম্ভবের পায়ে' বইটি ওই নামে বের হবে বলে তখনকার পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল) প্রকাশ-পূর্ব আলোচনা করতে গিয়েও অনুরূপ ইংগিত করেছেন। তাঁর ভাষায় : "কিছু কিছু শব্দ, যেমন দরোজা, মধ্যরাত, জাদুকর, অন্ধকার, আত্মা, মৃত্যু, উজ্জ্বল, অন্তরঙ্গ, রাত্রি, আলোকিত, নিঃসঙ্গতা, গোলাপ, অলৌকিক রফিকের কবিতায় পৌনঃপুনিক বিচরণ করে (স্মরণীয় বোদলেয়ার)।

৪

'অসম্ভবের পায়ে' কাব্যগ্রন্থে ষাটের দশকের ছবি এঁকেছিলেন রফিক আজাদ, ওই দশকের পাপ ও পবিত্রতার। যদি ষাটের দশকেই এই কবিতাগুলো গ্রন্থিত হয়ে বেরোতে পারত, তবে, এই বইয়ের মধ্যে ওই সময়কার বিক্ষত মুখচ্ছবিকে সমকালীন পাঠকেরা রক্তময় পরিপূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করতে পারতেন— এ বই চিহ্নিত হয়ে যেত নিপতিত সময়ের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থ হিসেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় নি।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ন্যায়সংগত সময় থেকে অনেক দেরি করে-১৯৭২ এ। যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন— রফিক আজাদ যে সময়ের অশ্রুবসিত চিত্র এঁকেছিলেন, সে সময়, আমাদের জীবনের অনেক সোনালি মুহূর্তের সঙ্গে ইতিপূর্বেই অতীতের উৎরাইয়ে হারিয়ে গেছে এবং নতুন জীবনাগ্রহে স্পন্দিত নতুন কাল নতুন ভাষায় এবং শব্দে কথা বলে উঠেছে এমনকি তাঁর নিজের কবিতাতেও। আর এরই ফলে নতুন সময়ের নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনায় উচ্চকিত পাঠক এই পুরোনো সাফল্যটির মূল্যায়নে পরিপূর্ণ মনোযোগ দেবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। মাহবুবুল আলম তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনাটিতে ১৯৭০ সালেই এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে লিখেছিলেন : "যে রচনারীতিতে আলোচ্য অপ্রকাশিত গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ রচিত, তা ইতিমধ্যেই প্রাচীনতা লাভ করার পথে। সুতরাং কথিত পুস্তকের প্রকাশনার জন্যে যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তার গুরুত্ব প্রাকৃতিক নিয়মেই উপশমিত হচ্ছে।"

প্রকৃতিরাজ্যের সময়োচিত ফলোৎপাদনের মতো কবিতাজগতে কবিদের গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারটি যথাসময়ে না ঘটলে তা যে কী অহেতুক খেসারতের কারণ ঘটাতে পারে, রফিক আজাদের 'অসম্ভবের পায়ে' তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। খুশির কথা, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে'র বেলায় এ ভুল ঘটে নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের মাঝখানকার কয়েক বছর কবিতা রচনা থেকে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের কাল-– এই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বিরতি এই দুই বইকে বিষয়-প্রকরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিষয় অধঃপতিত সময়, দ্বিতীয় গ্রন্থের : জাগ্রত দেশকাল। বললে কি খুব ভুল হবে যে দুটি আলাদা ভাষায় ও শব্দে এ বই দুটি রচিত— দুটি প্রায় যোগাযোগরহিত ভিন্ন মানুষের আলাদা জীবন-চেতনার উৎসার?

আমার এ আলোচনা অবশ্যই রফিকের কবিতার মূল্যায়নের কোনো সার্বিক উদ্যোগ নয়। মনেও হয় না একজন কবির কোনো একটিমাত্র কাব্যের ওপর নির্ভর করে তা সম্ভব, বিশেষ করে রফিকের মতো একজন কবির— যিনি ইতোমধ্যেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এসে সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। তবু এ আলোচনা শেষ করার আগে রফিক আজাদ সম্বন্ধে অন্তত একটা কথা বলে নিতেই হবে। রফিক আমাদের সেই বিরল কবিদের একজন যাঁরা কবিতার ফর্মের ব্যাপারে অসাধারণ সজাগ। কবিতায় শুদ্ধ সারাৎসারকে উপহার দিতে চান বলেই তিনি কবিতায় সংহতি ও নিটোলতাকে সনিষ্ঠভাবে অন্বেষণ করেন। তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রুজু করা চলে, অনেক স্খলন-ত্রুটি

দেখানো সম্ভব। সাংগীতিক অনটনে তাঁর কবিতা অনেকখানেই নীরক্ত ও নিশ্চল, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। উজ্জ্বল তীব্র আবেগস্পন্দনে উচ্চকিত নয় বলে রফিক আজাদের কবিতা মূল্যবান কাব্যোপচার নিয়েও প্রতিভাবান মাঝারিত্বকে অনেকখানেই ডিঙোতে পারে না। এ সব অভিযোগ উঠেছেও তাঁর বিরুদ্ধে—হয়তো ওঠানো চলেও। কিন্তু শিথিলতার, আতিশয্যের, অমনোযোগের, অব্যস্থাপনার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে অচল। নিপুণ যত্নে, বাহুল্য সরিয়ে, সব রকম আতিশয্য মুছে, তিল তিল করে, চেতনার অসংকলিত উপাদান থেকে তিনি তুলে আনেন কবিতার সংহত শরীর। যতদূর মনে করি এই সংহতিচর্চায় তিনি সচেতনভাবেই মাইকেলের আদর্শ অনুসারী এবং কাব্যকুশলতার অন্যান্য অনেক সাফল্যের মতো এই দুর্লভ সংহতির কারণেই তিনি আমাদের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম।

১৯৭৫

চিত্ত ভট্টাচার্য্যের
'ফুলদানী ও শেষ হাসুহানা'

কোনো লেখক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য তখনই নির্ভরযোগ্যতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছোয়, যখন সে লেখক হন আমাদের অপরিচিত, তাঁর কণ্ঠস্বর থাকে অচেনা এবং তাঁর নিজের রচনার ভাষা, আমাদের বহুল ব্যবহারে জীর্ণ ও নিঃশেষিত না হওয়ায়, এখনও পর্যন্ত আমাদের রসনাকে সজীব রাখতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের পরিচিতদের বেলায় এ মত খাটে না। আমাদের পরিচিতরা তাঁদের পরিচয়ের সুবাদে যেহেতু আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগার অনেকখানিই অধীন, সুতরাং, তাঁরা আমাদেব কাছে অল্পবিস্তর প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে অবহেলিত হয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং আমাদের হাতে তাঁদের লেখার আলোচনা অধিকাংশ সময় আমাদের দ্বারা তাদের ব্যক্তিগত বিবেচনার কবলে পড়ে অন্যায়রকম অল্প বা অতি মূল্য পেয়ে মূল্যহীন হয়ে যায়।

চিত্ত ভট্টাচার্য্যের লেখার আলোচনা আমার পক্ষে অনেকটাই সুবিধাজনক এ জন্য যে তিনি আমার অপরিচিত। তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর—যা উচ্চকণ্ঠ না হলেও কণ্ঠহীন নয় আদৌ, এবং কয়েকটা স্পর্শকাতর গুণের দ্বারা অন্তঃসত্ত্ব, পশ্চিম বাংলার ঘরোয়া শ্রোতাদের এলাকা পেরিয়ে একদিন আমাদের মনের প্রতিবেশী হয়ে উঠবে এমন আশা করা যেতে পারে। সেই সম্পন্নতা আছে তাঁর লেখায়। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ হল তাঁর লেখায় পরিবেশের রং আছে। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলা, তার কাছাকাছি লালমাটির অঞ্চল, শালের বন আর তার ভেতরকার বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুষ, যারা শান্ত নিরুপদ্রব, সমাজশাসিত, অথচ লোভ, হিংসা, অনুভূতিতে ভালোবাসায় অন্যদের মতোই সাধারণ মানুষ—চিত্ত ভট্টাচার্য্যের গল্পে সচকিত পদপাত রেখেছে। আমাদের পূর্ব বাংলার প্রকৃতি-প্রভাবিত গাছপালার ছায়া-পড়া চোখে সেইসব

অপরিচিত চেহারা, তাদের স্বর, আচরণ, ভাষা খানিকটা অদ্ভুত লাগলেও তারা সেখানকার নির্ধারিত আকাশের নিচে অনিবার্য এবং সুপরিচিত। এ গল্পগুলোর ভেতর সেইসব দৈনন্দিন, মসৃণ, টেরিকাটা মানুষের সহজ পরিচয় আছে, যেমন আছে ঐ এলাকার পাতা আর গাছের। অথচ কোনো সবুজ ক্ষেতের উপর হঠাৎ গর্জিয়ে ওঠা কারখানার মতো উৎকট চিৎকারে তা সে জায়গার চিরকালের পরিচয় অস্বীকার করে না,—বরং বেড়ে ওঠে সেখানকার গাছের মতো, ঘাসের মতো।

কোনো এক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন যে, 'বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস আসলে কবিতার দ্বারা গদ্যের রাজ্য জয়ের ইতিহাস।' কথাটার মূল অর্থ সম্ভবত এই যে, এ যুগের কবিতা কবিতা হিসেবে মরে গিয়ে গদ্য হিসেবে বেঁচে উঠছে। (উক্তিটির বাইরের আবরণে একটা নতুনত্বের চমক থাকলেও এ যুগের সাহিত্যমন বিশ্বাস করতে বাধ্য যে একজন কবির পক্ষে এভাবে কবিতার ওপর গদ্যের বিজয় এবং 'মৃত্যুহীন কাব্যদেবীর মৃত্যুর সার্থকতম ঘোষণা এর চাইতে শোভন ভাষায় করা সম্ভব হত না।) ফলে এ যুগের গদ্য বাইরের দিক থেকে গদ্য হলেও ভেতরে ভেতরে কবিতা। যেহেতু এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য অনেকখানিই কবিদের দান, সুতরাং এ যুগে গদ্য লিখে নাম করা কবিদের পক্ষেই সুবিধাজনক। অন্তত কবিমন না থাকলে যে তা প্রায় অসম্ভব, একথা খানিকটা জোর দিয়েই বলা যায়। চিত্ত ভট্টাচার্য্য নিজে কবি, সুতরাং ভালো গদ্যকার হওয়ার ব্যাপারে একটা দরকারি পুঁজি তাঁর হাতে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যে গল্পগুলোর মধ্যে লেখক সেটাকে লাভের দিকে খাটাতে পেরেছেন। তাঁর গল্প পড়তে গিয়ে আমরা যেন কতকগুলো কবিতাকেই পড়ি। অথচ কবিতা পড়ি বলে আবার গল্পের আস্বাদ থেকেও বঞ্চিত হই না, কেননা এগুলো আসলে গল্প, এবং গল্পের যোগান দিতে গিয়ে কবিতার অযাচিত উপচারে গল্পের টেবিলকে অস্বস্তিকর করে তোলেন নি। তবু এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, চিত্ত ভট্টাচার্য্যের বর্তমান রচনায় প্রতিশ্রুতির চাইতে সাফল্য কম। চরিত্রগুলোকে চোখে পড়ে প্রায়ই অসম্পূর্ণ শরীরে, শিশু মানুষের অপরিপূর্ণ নির্বোধ অসংগতি রয়েছে সবখানে, সম্পূর্ণতা পাচ্ছে না যেন কোথাও। সেইসব অনেক অসমাপ্ত মানুষের কান্না আছে এ বইয়ে, আর তাদের অসম্পূর্ণতার দীর্ঘশ্বাস। প্রায় প্রতিটানেই অভিজ্ঞতার অভাব ধরা পড়েছে। কিন্তু এ সব ছাড়াও গল্পগুলোর যা সবচেয়ে বড় অক্ষমতা তা হল যে গল্পগুলোর নিজস্ব কোনো ভার নেই। সব কিছুই যেন ঠুনকো, হালকা, লঘুপদী; না আটকাচ্ছে কোনোখানে না ঠেকছে। জীবনের কোনো গভীরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের স্তব্ধ স্বর শোনানোর মনোযোগী আগ্রহ উদ্যোগী নয় প্রায় কোথাও।

গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে আমার ধারণা এগুলোর মধ্যে গল্পকারের ব্যক্তিগত কণ্ঠ খুব বেশি রকম উৎসাহী। এতে তাঁকে বক্তার ভূমিকায় আসে পড়েছে। গল্পের আঙ্গিক হিসেবে এই স্বভাব কিছু পুরোনো নয় কি?

এক ধরনের বই আছে যেগুলো পড়ার পর সেগুলোর বিষয়বস্তুকে সাফল্যের সঙ্গে ভুলে যাবার ক্ষমতা দেখানো ছাড়া পাঠকের উপায় থাকে না। চিত্ত ভট্টাচার্য্যের এ বই, বলা বাহুল্য, ত্রুটির দিক মনে রেখেও, সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। এ বই পড়ে কোনো লাভ হয় নি এমন কথা বলা কঠিন হবে—এবং তা এ জন্যে যে, পড়া শেষ হবার পরও তা আমাদের মস্তিষ্কভার মুক্তি দেয় না, এবং এর চরিত্র, এর ভেতরকার আকাশ পৃথিবী আমাদের মাথার চারপাশে ঘুরপাক খায়, 'আমাদের ক্লান্ত করে। 'স্মৃতিগন্ধা গল্পের সেই মেয়েটা, গাছপালার আকর্ষণে পথ হেঁটে যে চলে যাবে—গভীর অসুখ ক্ষয় ক্ষয়ে যে অস্বাভাবিক বিবর্ণ আর মর্মান্তিকভাবে স্বপ্নহীন—জীবনের জন্যে তার আকৃতি আমাদের চিন্তাকে স্বস্তি দেয় না। অথবা 'বিন্দু সাধনের হতভাগা ডাক্তার শীল, মৃত্যুর প্রত্যাশা বুকে তাঁর, জীবনের জঘন্য নরক থেকে মুক্তি পাবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষায় মাথা খুঁড়ে পৃথিবীর অন্ধকার অসহায়তার ভেতর পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, কিংবা 'ফুলদানী ও শেষ হাসুহানা গল্পের ফুলের প্রতিনিধি অপূর্ব মেয়েটা, যে আর আসবে না—সেইজন্যে ফুলদানীতে হাসুহানা ভরা হবে না আর,—আমাদের মনকে তাড়া করতে থাকে।

বই পড়া সম্পর্কে কোনো লোকশ্রুত মনীষী মন্তব্য করেছিলেন কোনে কোনো বই মোটামুটি পড়ে রেখে দেওয়াই ভালো, কিন্তু কিছু বই ভালো করে পড়বে। কথাটার মূল অর্থ হল, বইমাত্রই পড়বার যোগ্য নয়। বিশেষত এই প্রসবশীল বিজ্ঞানের যুগে যখন মানুষের মনের অনুভূতি মাত্রই ছাপার আকারে বেরিয়ে বইয়ের স্তূপকে কেবলই উঁচু বানিয়ে তুলছে, যখন সেইসব অগণিত জঞ্জালের মধ্যে এমন পঙক্তির সাক্ষাৎ দুর্লভ সেখানে মানুষের হৃদয় সহজ ভাষায় মুখ খুলতে চায়। চিত্ত ভট্টাচার্য্যের 'ফুলদানী ও শেষ হাসুহানা এমন একটা বই যাকে পড়া চলে, বারবার না হলেও ভালোভাবে। এবং পড়া চলে, কেননা খানিকটা আকাশ রোদ আলোর খোঁজে এখানে মিলবে, এবং নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব হবে না।

১৯৬৩

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET